গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

ISSN 2582-5674

বর্ষ - ১৭ সংখ্যা- ২০২০ RNI : WBBEN/2003/11192 মূল্য : টাকা

সূচি

১ আমাদের কথা

২ প্রচ্ছদ কথা
শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার
রতন দেবনাথ

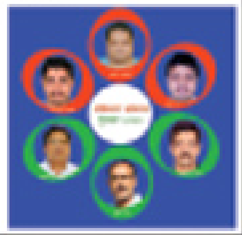

৪ করোনা অতিমারি শেষ করবে ?
ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

৬ আপেক্ষিক তত্ত্ব : একটি সহজ পাঠ ?
অনিন্দ্য দে

১০ ছোট মাছ বড় মাছ?
জয়দেব দে

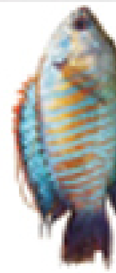

১২ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান
অনিন্দ্য দে

২০ সংবাদ

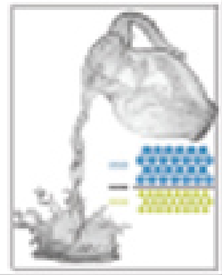

১৩ বাজি ও করোনা

১৪ সূচকীয় হারে বৃদ্ধি
অমিতাভ চক্রবর্তী

১৬ কবিতা
নির্মাল্য দাশগুপ্ত
জগন্ময় মজুমদার
রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণ মিত্র
দিব্যদীপ দে
অরুন চক্রবর্তী

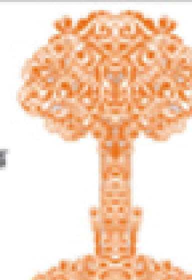

১৮ বুদ্ধিমত্তা
দিগন্ত পাল

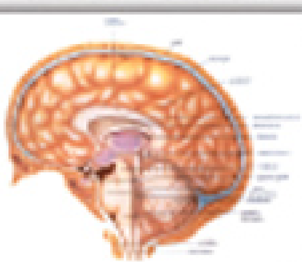

২১ নতুন গবেষণার অলিন্দে
অমিতাভ চক্রবর্তী

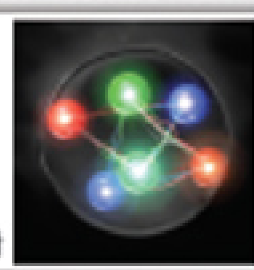

২২ ফাস্ট ফুড
কৌশিক রায়

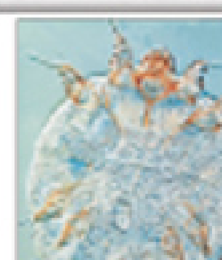

২৩ নীহারিকা
তন্ময় ধর

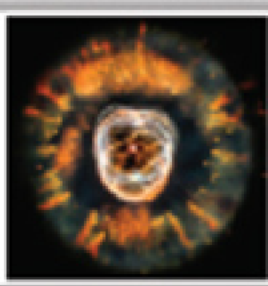

২৪ জ্যোতিষের শূন্য গর্ভতা
গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

২৮ কুসংস্কার
ভূত নাবানো
কালী প্রসন্ন সিংহ

৩০ পরিবেশ
আন্তঃ সীমান্ত নদী
অনুপ হালদার

৩২ চিঠি চিঠি চিঠি

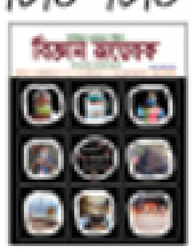

৪র্থ প্রচ্ছদ
যারা হারিয়ে যাচ্ছে
রাজা রাউত

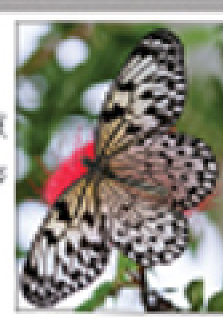

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক
তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী

জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সর্দার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু, সৌরভ মুখার্জী

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :
bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :
9874778216, 9143264159

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা
তাপস মজুমদার
অঙ্কন
সৌরভ মুখার্জী

সুভাষিতম্

আমি জীবন সম্বন্ধে যা কিছু জেনেছি তা তিনটি শব্দে বলতে পারি : জীবন চলমান

—রবার্ট ফ্রস্ট

আমাদের কথা : আশায় আশায়

খুব অল্প সময়ে দুই মহীরুহের মৃত্যু হল।
একদিন সৌমিত্রর, কয়েকদিনেই মারাদোনার।
একজন করোনার জন্য
অন্যজন করোনার সময়ে, হয়ত অবসাদকে সাথে নিয়ে।

এই করোনা কালেই অনেকেরই মৃত্যু হল।

তাই বলা যায়, এই সময় দুঃসময়
এই সময় অন্ধকারের।

তবু জীবনের বিচিত্র শর্তে,
জীবনের অনেক অনেক হর্স পাওয়ার
জ্বালানীর প্রয়োজনে,
প্রতিদিনের ক্ষুধার চাহিদাতে
মানুষ পথে বেরোয়।
কেউ সাবধানে পা ফেলে।
আবার কেউ অধৈর্য অসাবধান হয়,
মেলামেশার বাধ্যবাধকতায়।
এভাবেই মানুষ জীবনদ্বীপ জ্বালিয়ে রাখে।
মানুষ আশায় আশায় প্রতীক্ষায় থাকে
ভ্যাকসিন আবিষ্কারের—
যা কখনো হয় অক্সফোর্ডের অ্যাস্ট্রোজেনেকা
বা রাশিয়ার স্পুটনিক ভি।
কখনো আমেরিকার ফাইজার
কিংবা কোভ্যাকসিন ভারতের দিকে।

শুধু একটি কামনা
এ প্রতীক্ষার অবসান হোক।

—তাপস মজুমদার

বি.দ্র. : ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের দ্বিমাসিক পত্রিকাটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত করতে পারছি না। দুটি সংখ্যাকে একটি সংখ্যা অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০ সংখ্যায় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। এইজন্য আমরা দুঃখিত। —সম্পাদকমন্ডলী

ISSN 2582-5674
9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১

র ত ন দে ব না থ

শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার ২০২০ এবং বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা

শুভদীপ চ্যাটার্জী

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

সুর্যেন্দু দত্ত

কিংশুক দাশগুপ্ত

রজতশুভ্র হাজরা

সুরজিৎ ধাড়া

শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার ভারতের বিজ্ঞান গবেষণায় সর্বোচ্চ পুরস্কার। বিজ্ঞানের সাতটি বিষয়ে প্রতি বছর পঁয়তাল্লিশ বছরের কম বয়েসী বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেওয়া হয় এই পুরস্কার। যে যে বিষয়গুলিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয় সেগুলি হল—জীববিজ্ঞান, কারিগরী বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান এবং ভূ-বিজ্ঞান। কাজের সাম্মানিক স্বীকৃতি ছাড়াও পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয় নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা। ভারতের প্রখ্যাত রসায়নবিদ এবং কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর প্রথম ডিরেক্টর জেনারেল পদ্মভূষণ স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর-এর সম্মানেই দেওয়া হয় এই পুরস্কার। এ বছর ১৪ জন সেরা বিজ্ঞানীকে দেওয়া হয়েছে এই পুরস্কার যার মধ্যে রয়েছেন বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানী।

জীববিজ্ঞানে এই পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ড. শুভদীপ চ্যাটার্জী। হায়দরাবাদের সেন্টার ফর ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং অ্যান্ড ডায়াগ্নস্টিক্স-এর এই অধ্যাপক যে গবেষণামূলক কাজের জন্য মনোনীত হয়েছেন তা হল কোরাম সেন্সিং। কোরাম সেন্সিং আসলে কি? আমরা জানি অনুজীব ব্যাকটেরিয়ারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটায় রোগ সংক্রমণ। পোষক কোষকে আক্রমণ করে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকে বেশ কিছুদিন। তবে সংক্রমণের কাজটা পোক্ত হয় যদি সঙ্গী হিসাবে আরও কিছু ব্যাকটেরিয়াকে সাথে পাওয়া যায়। আমরা যেমন কোন কাজ একা না করতে পারলে ডাকাডাকি করি বন্ধু-বান্ধবদের। সবে মিলে কাজ করে কাজ হাসিল করি। তেমনি ব্যাকটেরিয়াও চায় আরও সঙ্গী ব্যাকটেরিয়াকে সঙ্গে পেতে যাতে পোষক কোষকে কাবু করে ঘটাতে পারে রোগ সংক্রমণ। তবে ব্যাকটেরিয়া তো আর আমাদের মত ডাকাডাকি করে সঙ্গী জোগাড় করতে পারে না। যে প্রক্রিয়ায় ওরা এটা করে তাই হল কোরাম সেন্সিং। আক্ষরিক অর্থে কোরাম হল ন্যূনতম সংখ্যা যার কমে কোন প্রতিষ্ঠানের সভা করা যায় না আর সেন্সিং মানে আঁচ নেওয়া অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ারা যেন কোরাম সেন্সিং মাধ্যমে আঁচ নিচ্ছে তার আশেপাশে ন্যূনতম সংখ্যক সঙ্গী আছে কিনা।

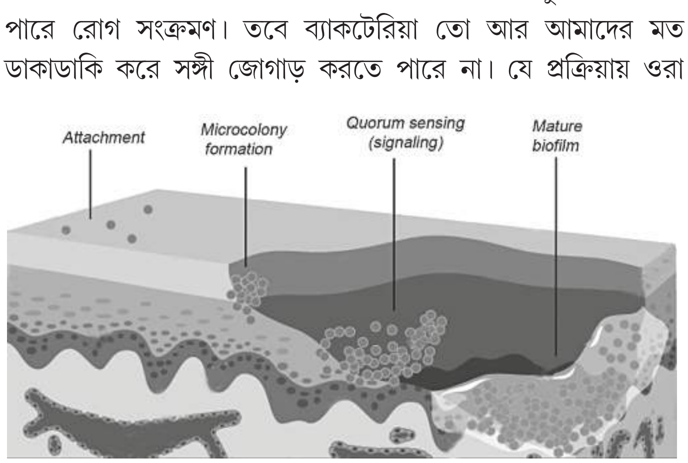

ত্বকে ব্যাকটেরিয়ার জৈব ফিল্ম তৈরি

পৃথিবীর চার ভাগের প্রায় তিন ভাগই জল। নদী-নালা, পুকুর, সমুদ্র জলময় হলেও সে জল কিন্তু পানের যোগ্য নয়। মূলতঃ ভূ-গর্ভস্থ জলই হল পানযোগ্য জলের উৎস। তবে ভূ-গর্ভস্থ জল মাত্রেই যে তা পানযোগ্য হবে তাও নয়। ভারতে ভূ-গর্ভস্থ জলের পান যোগ্যতার সুলুক-সন্ধানের জন্য ভূ-বিজ্ঞান বিভাগে এবারকার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারে সম্মানীত হয়েছেন খড়্গপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-এর অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ই প্রথম যিনি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ জলধারার এক মডেল মানচিত্র উপস্থাপন করতে পেরেছেন। এছাড়াও গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং ব-দ্বীপ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ আর্সেনিকমুক্ত জলভান্ডারের সন্ধানও তাঁর কাজের আর এক অঙ্গ।

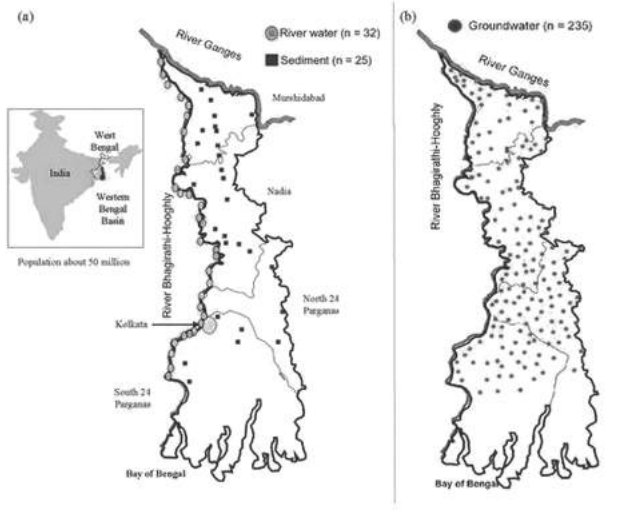

ভূ-জল ভাণ্ডারের মানচিত্র

ভূ-বিজ্ঞান বিভাগে ভাটনগর পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন আর এক কৃতী বাঙ্গালী অধ্যাপক সূর্যেন্দু দত্ত। মুম্বই-এর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-এর এই অধ্যাপকের গবেষণা মূলতঃ তরল হাইড্রোকার্বন পেট্রোলিয়াম-এর এক প্রাকৃতিক উৎস টার্পিনয়েড নিয়ে। টার্পিনয়েড কি? টার্পিনয়েড হল কার্বন ও হাইড্রোজেন সমন্বিত এক

প্রাকৃতিক জৈব যৌগ। উদ্ভিজ্জ এই জৈব রাসায়নিকটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতের তৈলখনি সমৃদ্ধ অঞ্চলে। যেসব গাছপালা যোগান দেয় এই টার্পিনয়েড সেসব গাছপালার ইতিহাস এবং তাদের বিবর্তন সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণামূলক নথি ছিল না। ভারতীয় উপমহাদেশে এই টার্পিনয়েড-এর ইতিহাস এবং তার বিবর্তন নিয়ে কাজ করেন বিজ্ঞানী দত্ত। এক সময় পশ্চিম ভারত যে ঘন বৃষ্টি-অরণ্যে ঘেরা ছিল এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানী দত্তেরই গবেষণালব্ধ ফল।

টার্পিনয়েডের উদ্ভিদ উৎস

কারিগরী বিজ্ঞানে পুরস্কৃত হয়েছেন আর এক বাঙ্গালী তনয়। মুম্বই-এর ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার-এর অধ্যাপক ড. কিংশুক দাশগুপ্ত। কার্বন ন্যানো ম্যাটেরিয়াল-এর সংশ্লেষণ এবং তার যথাযথ ব্যবহারের স্বীকৃতি হিসাবেই তাঁর এই পুরস্কার। তাঁর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কাজে লাগানো হয়েছে 'ভাবা কাভাস' নামে এক বুলেট প্রুফ জ্যাকেট তৈরিতে। এর আগে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট আনতে হত বাইরে থেকে। সেগুলো যেমন ছিল ভারী তেমনই ব্যায়বহুল। ড. দাশগুপ্ত উদ্ভাবিত জ্যাকেট তুলনায় হাল্কা। ভারতের বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী ড. হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা-এর নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়েছে 'ভাবা কাভাস'। জ্যাকেটটি তৈরিতে উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে

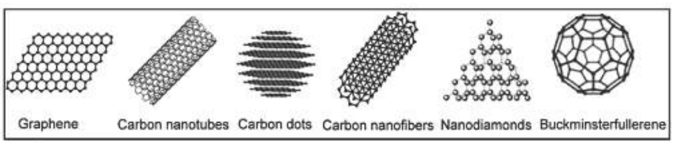

বিভিন্ন ন্যানো বস্তু

ন্যানো বস্তুর 'ভাবা কাভাস' জ্যাকেট পরাচ্ছেন

বোরন কার্বাইড, কার্বন ন্যানোটিউব এবং কিছু পলিমার।

গণিত বিভাগে এ বছর ভাটনগর পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক ড. রজতশুভ্র হাজরা। তাত্ত্বিক পরিসংখ্যা এবং গণিত বিভাগের এই অধ্যাপককে সম্মানিত করা হয়েছে তার ম্যাথমেটিকাল লিমিটস্ অব সেমি-ফ্লেক্সিব্যাল পলিমার সংক্রান্ত গবেষণার জন্য।

সেমি ফ্লেক্সিব্যাল পলিমার

পদার্থ বিজ্ঞানে এ বছর ভাটনগর পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন আর এক বাঙ্গালী বিজ্ঞানী। হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুরজিৎ ধাড়া পুরস্কার পেয়েছেন কলয়ডীয় পদার্থবিদ্যায় গত পাঁচ বছরে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য। লিক্যুইড ক্রিস্টাল বিজ্ঞানে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানও এই স্বীকৃতির আর এক অঙ্গ। কি এই লিক্যুইড ক্রিস্টাল? পদার্থ সাধারণত তিনটি বিভিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে। এগুলো হল ঃ কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থা। আবার তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থান্তরও হয় অর্থাৎ পদার্থ এক অবস্থা থেকে যেতে পারে আর এক অবস্থায়। কঠিন পদার্থে তাপ দিলে তা তরলে পরিণত হয়। কিন্তু এমন কিছু কঠিন পদার্থও রয়েছে যাদের উত্তপ্ত করলে সেগুলো একেবারে পরিষ্কার তরলে পরিণত না হয়ে কিছুটা ঘোলাটে তরলে পরিণত হয়। উষ্ণতা আরও বাড়ালে অবশ্য এরা পরিণত হয় পরিষ্কার তরলে। এসব পদার্থ কঠিন থেকে তরলে পরিণত হওয়ার সময় প্রায়-কঠিন এক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায় যেখানে এর মধ্যে থাকে কঠিনের কিছু ধর্ম আবার তরলেরও কিছু ধর্ম। এই অবস্থাটিই হল লিকুইড ক্রিস্টাল। আজকাল ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি ইত্যাদি যন্ত্রে লেখাগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করা হয় এই লিক্যুইড ক্রিস্টালের। এছাড়াও এলইডি টেলিভিশন, মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপের ঝকঝকে ছবিও দেখা যায় এই লিক্যুইড ক্রিস্টাল বা তরল কেলাসের কল্যাণেই।

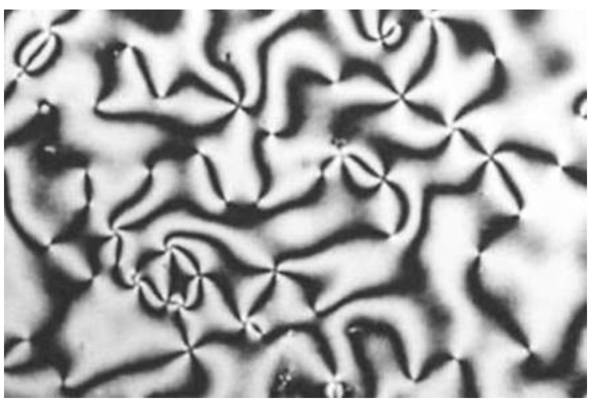

লিকুইড ক্রিস্টাল

email:rdebnath1961@gmail.com • M. 9477934928

ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

করোনা অতিমারী—শেষ কবে?

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আমাদের রাজ্যে বেড়েছে। এমনকি টেস্ট সংখ্যা কমিয়েও দেখা যাচ্ছে পজিটিভিটি পারসেনটেজ উর্দ্ধমুখী (গড়ে ৮%)। মোট আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ, মৃত্যু হয়েছে ৫ হাজারের ওপর মানুষের। একমাত্র স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার হার (৮৮%)। জাতীয় স্তরে সংক্রমণের হার কিছুটা কমের দিকে হলেও এখনও তা উদ্বেগজনকই। মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৭০ লক্ষ ছাড়িয়েছে, মৃত্যু হয়েছে ১ লক্ষের ওপর। সারা বিশ্বে কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বর্তমানে ৩৫ মিলিয়ন অর্থাৎ সাড়ে ৩ কোটি ছাড়িয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যাও ১ মিলিয়ন (১০ লক্ষ)-এর ওপর। ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশে সংক্রমণের হার কমে গেলেও আমেরিকা, ভারত ও ব্রাজিলে বেড়েই চলেছে। স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মত ইউরোপের কিছু দেশে তো দ্বিতীয়বার সংক্রমণের ঢেউ উঠেছে।

আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস কয়েকমাস পরে এলেও এখন ৮ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে সবাই বেশ নাজেহাল। একদিকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থমকে রয়েছে। ৬৮ দিনের ওপর দীর্ঘ লকডাউন কাটিয়ে ‘আন-লক’ পর্যায়েও মানুষ জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারেনি। অনেকেই স্বজনহারা হয়েছেন, বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এককথায়, অর্থনৈতিক ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত মানুষ এবার স্বাভাবিক হয়ে উঠতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগছে, আর কতদিন এভাবে চলবে? আমরা আবার কবে স্বাভাবিক জীবন ছন্দে ফিরব?

প্রথমে জেনে নিই, যেকোনও মহামারী বা অতিমারীর সমাপ্তি হয়েছে বুঝব কিভাবে?

১) চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায়, যখন রোগের সংক্রমণের পরিসমাপ্তি ঘটবে অর্থাৎ রোগীর সংখ্যা তথা মৃত্যুসংখ্যায় রাশ টানতে পারা যাবে।

২) সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে যেটা দাঁড়াবে, তা হচ্ছে যখন মানুষের যাবতীয় আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং নতুনভাবে আবার যখন জনগণ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে।

৩) প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে বলতে হয়, যখন প্রশাসন বা সরকার ঘোষণা করবে, তাদের এ ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে; নতুন কিছু করার নেই।

এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যেহেতু তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনটিই পরিপূর্ণতা পায়নি, তাই অতিমারী যে চলছে তা সহজেই অনুমেয়। এবার আসল প্রশ্ন, এই অতিমারী কবে শেষ হবে?

এককথায় এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমরা এর উত্তর খুঁজব অতিমারীর ইতিহাস ও পূর্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে এবং বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট কিছু মানুষের অনুমান-ভিত্তিক মন্তব্যের মধ্যে।

প্রসঙ্গতঃ বলি, আধুনিক সভ্যতার ভয়ংকরতম অতিমারী বলে পরিচিত স্প্যানিশ ফ্লু (বস্তুত H_1N_1 ইনফ্লুয়েঞ্জা) শুরু হয় ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, চলে ১৯২০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। মোট তিনটি ঢেউ-এর আকারে এই অতিমারীটি মানব সভ্যতাকে নাড়িয়ে দিয়ে ৫০ কোটি মানুষকে আক্রান্ত করে তোলে ও ৫ কোটি মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। অতটা ভয়াবহ না হলেও সাম্প্রতিককালেও সার্স ও মার্স যথাক্রমে ২ বছর (২০০২-২০০৪) এবং ৬ বছর (২০১২-২০১৮) চলেছিল।

তাই সহজেই অনুমেয়, এই ধরনের মহামারী বা অতিমারী একেবারে ক্ষণস্থায়ী নয়; তবে কতদিন (বলা ভাল, কত বছর) এর প্রকোপ থাকবে তা নির্ভর করে ভাইরাসের চরিত্র ও মানুষের সুশৃঙ্খল ‘স্ট্র্যাটেজি’ প্রয়োগের ওপর।

এবার আসি, এই বিষয়ে বিশিষ্ট কিছু মানুষ তথা বিশেষজ্ঞদের নিজস্ব মতামত কী, সে আলোচনায়।

মে মাসের গোড়ায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র মুখ্য বিজ্ঞানী শ্রীমতি সৌম্যা স্বামীনাথন বলেছিলেন, এই অতিমারী কম করে ৪-৫ বছর চলবে। আর আগস্ট মাসে হু-র প্রধান ট্রেড্রস আধানম সেব্রেয়েসাস জানালেন, আগামী দু-বছরের মধ্যে এই অতিমারীর পরিসমাপ্তি ঘটবে।

অনেকেই অতিমারীর সমাপ্তির সঙ্গে ভ্যাকসিন (টীকা) বাজারে আসার একটা যোগসূত্র দেখছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছেন, ২০২১ সালের গোড়ায় ভ্যাকসিন বাজারে আসতে

চলেছে। অবশ্য সবার কাছে এই ভ্যাকসিন সুলভে পৌঁছতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। কিন্তু এটাতেই সন্দিহান অনেকেই। স্বয়ং শ্রীমতি স্বামীনাথনের কথাতেই অবিশ্বাসের সুর। তাঁর মতে, ২০২২-এর আগে সবাইকে দেওয়ার মত ভ্যাকসিনের জোগান দেওয়াটাই চ্যালেঞ্জের।

ভারতের সর্ববৃহৎ ভ্যাকসিন উৎপাদক সংস্থা সিরাম ইনস্টিটিউটের মুখ্য প্রশাসক আদর পুনাওয়ালা ফিনানশিয়াল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে একধাপ এগিয়ে বলেছেন, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের কাছে ভ্যাকসিন পৌঁছতে কমপক্ষে ২০২৪ লেগে যাবে।

বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা ভ্যাকসিন দিয়ে অতিমারী রোখার এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন। ভ্যাকসিন নিয়ে সাম্প্রতিক মাতামাতির নিন্দা করেছেন অনেকেই। এতে যে 'ভুয়ো-সুরক্ষিত' হবার ভাবনায় আমরা মগ্ন হচ্ছি, সেকথাও বলছেন অনেকেই। রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুটেরেস সম্প্রতি এক সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। তা হল—শুধু ভ্যাকসিন আমাদের এই অতিমারী থেকে রক্ষা করতে পারবে না। এর জন্য দরকার মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের সংঘবদ্ধ লড়াই। টেস্টিং, কনট্যাক্ট ট্রেসিং ও আইসোলেশনের পাশাপাশি মাস্ক পরা, হাত ধোয়া ও দূরত্ববিধি মানা কম করে আরও ১২ মাস চালিয়ে যেতে হবে। তিনি এও বলেন, এটা মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন রোগের একডজন ভ্যাকসিন বর্তমানে বাজারে চালু থাকলেও আমরা কেবলমাত্র স্মলপক্সকে পৃথিবী থেকে তাড়াতে পেরেছি। সুতরাং করোনা যে এত সহজে পৃথিবী থেকে চলে যাবে তা ভাববার কারণ নেই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংক্রামক রোগের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অ্যালার্জি এন্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিজেস-এর ড. অ্যান্টনি ফ্যসি আশার কথা শুনিয়েছেন। 'বিজনেস ইনসাইডার'কে সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, জনস্বাস্থ্যের বিধি মেনে চললে আমেরিকানরা আবার স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফিরতে পারবেন ২০২১ এর শেষভাগে। তাঁর মতে সব ঠিকঠাক চললে, অতিমারীর পরিসমাপ্তি ঘটবে ২০২১ এর শীতের শেষে। বড়জোর ২০২২ এর বসন্তের শুরুতে।

তবে এটা তখনই সম্ভব, যদি আমরা ভ্যাকসিন ব্যবহারের পাশাপাশি সমস্ত স্বাস্থ্যবিধিগুলো ঠিকভাবে মেনে চলি। কিছু বিশেষজ্ঞ অবশ্য করোনা ভাইরাস তথা কোভিড-১৯ পুরোপুরি নির্মূল হওয়াটাকে এক সুদূর পরাহত ব্যাপার বলে মনে করছেন। তাঁদের মতে বর্তমানে ঘটে চলা সামগ্রিক সামাজিক সংক্রমণ রুখতে পারলে, পরবর্তীতে বিশ্বের কিছু ছোট অংশে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘটা সংক্রমণের মোকাবিলা সহজেই করা যাবে।

অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এপিডেমিওলজিস্ট সাইমন থর্নলে-র যুক্তি করোনা ভাইরাসকে পুরোপুরি তাড়ানোর চিন্তায় মগ্ন না থেকে আমদের উচিত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বাড়িয়ে কিভাবে বয়স্ক ও ঝুঁকিপ্রবণ রোগীদের সুরক্ষা দেওয়া যায়, তা চিন্তা করা। আবার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ভন ম্যালডোনাডো মনে করেন, এই অতিমারী স্প্যানিশ ফ্লু-এর মত ঢেউ আকারে ২-৩ বার আছড়ে পড়তে পারে। তাই সামগ্রিকভাবে তৈরি থাকাটা আসল লক্ষ্য হওয়া উচিত। টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ 'ক্যাথেরিন ট্রইসি'-র অনুমান, এই নভেল করোনা আমাদের বহু ব্যাপারে অবাক করেছে, আগামী দিনগুলোকে এমনই আরও চমক আমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

তাই একথা বলাই যায়, করোনা অতিমারীর পরিসমাপ্তি-কাল নির্ণয়ে অতীতের অভিজ্ঞতা না অনুমানভিত্তিক ভবিষ্যবাণী, কোনটা সঠিক কাজে আসবে, তার উত্তর সময়ই দেবে। আপাততঃ তাই আমাদের স্বাভাবিক (পড়ুন প্রাকৃতিক) নিয়মে ভাইরাসের তান্ডবলীলা কমার উপর ভরসা করতে হচ্ছে।

email : joardar69@gmail.com • M. 9231533335

অ নি ন্দ্য দে

আপেক্ষিক তত্ত্ব ঃ একটি সহজ পাঠ

পূর্বকথা

গতি বিষয়টা আপেক্ষিক হলেও বস্তুর পরম গতি নির্ণয় করে ফেলাটা অসম্ভব কিছু নয়, এরকম একটা ভাবনা থেকেই তৈরি হয়েছিল ইথারের ধারণা। কোনও বস্তুর পরম গতি এই ইথার সমুদ্রের সাপেক্ষে তার আপেক্ষিক গতি এরকম একটা ভাবনা নিয়েই আরও অনেকের সাথে মাইকেলসন আর মর্লে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইথারের অস্তিত্ব খুঁজে বের করার চেষ্টায়। কিন্তু, না। সে চেষ্টা ব্যর্থ হল। শুরু হল ইথার তত্ত্বকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে নানারকম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের। এল বস্তুর দৈর্ঘ্য আর সময় সংকোচনের মত অদ্ভুত কিছু ধারণাও। কিন্তু ইথার যদি থেকে থাকে তাকে আড়াল করে রাখার জন্য প্রকৃতি এইভাবে দৈর্ঘ্য আর সময়ের পরিবর্তন করে নেবে, সেটা পদার্থবিদেরা ঠিক বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। এর পরের পর্বটা একটা ইতিহাস। এবারে আসব সেই ইতিহাসের কথায়।

তৃতীয় পর্ব

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তখন সুইস পেটেন্ট অফিসের কর্মী। হৈচৈ হচ্ছে মাইকেলসন মর্লের পরীক্ষা নিয়ে। তার সাথে সাথে আরও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রীতিমত একটা অস্বস্তির আবহ তৈরি হয়ে গেল। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকেও বেশ গোলমেলে বলে মনে হতে শুরু করল। পেটেন্ট অফিসের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে আইনস্টাইনও ভাবতে শুরু করেছেন সমস্যাগুলোকে নিয়ে। ছোটবেলা থেকেই প্রকৃতির নিয়মকানুনগুলো সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অনুরাগ। শুরু সেই চার-পাঁচ বছর বয়সে বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটা কম্পাসের সূত্র ধরে। বারো বছর বয়সে হাতে পেলেন ইউক্লিডীয় জ্যামিতির একটা বই। শৈশবের এই 'বিস্ময়' তাঁকে সারা জীবন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। কম্পাসের নড়াচড়ায় প্রতিভাত হয়েছে আমাদের অস্তিত্বের বাইরে যে বৃহত্তর বিশ্বজগৎ তার গঠনের ভৌত জ্যামিতির রূপ। আর ইউক্লিডীয় জ্যামিতি তাঁর কাছে বিশুদ্ধ জ্যামিতির প্রতীক, সেখানে সবকিছুই পরম নিশ্চিত কিন্তু বাস্তব জগৎ নিরপেক্ষ। ষোল বছর বয়সের মধ্যেই নিজেকে আরও পাকাপোক্ত করে তুলেছিলেন স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আর কলনবিদ্যার বেশ কিছুটা অংশ রপ্ত করে। সেইসব কিছুর মিশেলেই জন্ম নিয়েছিল বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব, পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে 'আইনস্টাইন বিপ্লব'। কিন্তু কী ছিল সেই তত্ত্বে? এবারে সেই কথাতেই আসব।

হেনড্রিক লোরেনৎস আর ফ্রান্সিস ফিৎসজেরাল্ড যে ইথারের অস্তিত্বটাকে টিঁকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন সেকথা আমরা আগেই জেনেছি। স্থির বস্তুর পরম দৈর্ঘ্য আর পরম সময়ের ধারণাটাকে বজায় রেখেই তাঁরা ভাবতে চাইছিলেন ইথার বায়ু "পরম" দৈর্ঘ্য আর সময়কে পালটে দিচ্ছে। আইনস্টাইন কিন্তু সেভাবে ভাবলেন না। দৈর্ঘ্য আর সময়ের পরিমাপ বস্তু আর দর্শকের আপেক্ষিক বেগের উপর নির্ভরশীল লোরেনৎসের সাথে এই জায়গাটায় একমত হয়েও তিনি ইথার বায়ুর অস্তিত্বটাকেই অস্বীকার করলেন (যদিও লোরেনৎস যে এভাবে ভাবছেন সেটা তখনও তিনি জানতেন না)। মাইকেলসন মর্লের পরীক্ষায় ইথার বায়ুর অস্তিত্ব ধরা পড়েনি কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে আর্নস্ট ম্যাকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জবাব দিয়েছিলেন ঃ ইথার বায়ু নেই তাই। সুতরাং পরম দৈর্ঘ্য আর পরম সময়েরও কোনও অর্থ নেই। ইথার নেই একথা না বললেও, সুষম গতি মাপার ক্ষেত্রে যে তার কোনও গুরুত্ব নেই সেকথা বুঝিয়ে দিলেন স্পষ্ট ভাষায়। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্বের এটাই মূল চাবিকাঠি।

কিন্তু কীভাবে পৌঁছলেন তিনি এই সিদ্ধান্তে? সুষমভাবে গতিশীল বস্তুর উপর চেপে বসে যেকোন যান্ত্রিক পরীক্ষাই করা হোক না কেন, তাতে আমি গতিশীল সেটা যে প্রমাণ করতে পারব না সনাতন পদার্থবিদ্যায় সেকথা স্পষ্ট করেই বলা হয়েছিল। যেমন, সমস্ত দিক বন্ধ একটা ট্রেন সুষম বেগে চলতে থাকলে ভিতরে বসে ট্রেনটা যে চলছে সেটা বোঝা যায় না। ট্রেনে বসে একটা বল উপরের দিকে ছুঁড়ে দিলে দেখব বলটা সোজা উপরে উঠবে আর কিছু সময় পরে সোজা নীচে নেমে এসে আমার হাতেই পড়বে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে থাকলেও এমনটাই হত। কিন্তু লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ট্রেনের ভিতরটা দেখতে পেত তাহলে সে বলটাকে একটা বাঁকা পথে যেতে দেখত। আইনস্টাইন বললেন এই পরীক্ষাটাই যদি আলো নিয়ে, বলা ভাল কোনও তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে করা হত, তাহলেও ভিতরে বসে ঐ ট্রেনের গতি বোঝা যেত না। সেটা বুঝতে হলে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতে হবে, দেখতে হবে একটা গাছ বা একটা ইলেকট্রিক পোস্ট পেছন দিকে সরে যাচ্ছে কি না। সেক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। ট্রেন এগোচ্ছে না গাছ পিছিয়ে যাচ্ছে সেটা এখানে বলা যাবে না; গাছ, মাটি, ইলেকট্রিকের খুঁটির সাথে ট্রেনের একটা আপেক্ষিক গতি আছে, শুধু এইটুকু বলা যাবে। ব্যাস, আর কিছু নয়।

কিন্তু যদি দুটো গতিশীল বস্তু থাকে তাহলে কি হবে? ধরা যাক, দুটো মহাকাশযান A আর B একে অন্যের দিকে সুষম গতিতে ছুটছে। সেক্ষেত্রে কি ঐ দুই মহাকাশযানের যাত্রীরা নীচের কোনও একটা সিদ্ধান্তকে 'চরম সত্য' বলে বেছে নিতে পারবেন?

1. A স্থির, B গতিশীল 2. B স্থির, A গতিশীল 3. দুটোই গতিশীল

আইনস্টাইনের উত্তর—না। কোনভাবেই তারা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন না। চাইলে দুই মহাকাশযানের যাত্রীরাই A মহাকাশযানকে স্থির নির্দেশতন্ত্র হিসেবে বেছে নিতে পারেন। কিন্তু কোনও পরীক্ষাতেই, সেটা যান্ত্রিক পরীক্ষাই হোক অথবা আলো বা তড়িৎ বা চুম্বকত্বের কোনও পরীক্ষাই হোক, তাদের এই পছন্দটা ভুল হয়েছে এমন কথা

বলা যাবে না। B মহাকাশযানকে স্থির নির্দেশতন্ত্র ধরে নিলেও একই ব্যাপার হবে। আবার দুটো যানের বাইরের কোনও বিন্দুতে একটা স্থির নির্দেশতন্ত্র ধরলে দুটো যানকেই গতিশীল বলে মনে হবে। ফলে

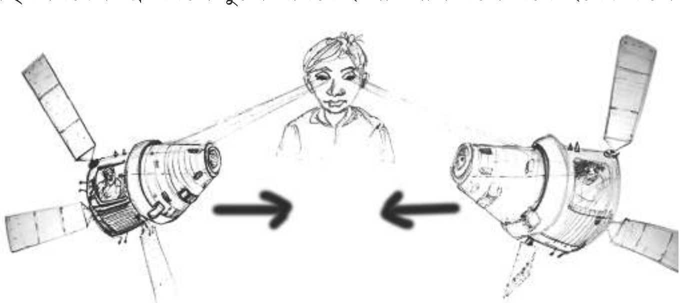

এটা ঠিক বা ওটা ভুল এরকম ভাববার কোনও জায়গা নেই। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে পরম গতির ধারণাটাই পুরোপুরি অর্থহীন। বাস্তব সত্য একটাই—মহাকাশযান দুটো ক্রমশ পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, আর তাদের আপেক্ষিক গতির বেগ সুষম। এটাই আইনস্টাইনের মাস্টারস্ট্রোক। পরম গতির ধারণাটাকে তিনি একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন।

তাহলে তো ইথারের মত সার্বজনীন, স্থির কোনও নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষেও সুষম গতি পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আর তাই যদি হয়, আইনস্টাইন দেখালেন, তাহলে আলোর আচার-আচরণ সম্পর্কে আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলোতেও কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাবে। ব্যাপারটাকে একটা উদাহরণের সাহায্যে বলার চেষ্টা করা যাক।

ধরুন মহাকাশযানে চেপে একজন নভশ্চর মহাকাশ ভ্রমণে বেড়িয়েছেন। তার মহাকাশযানের বেগ আলোর বেগের অর্ধেক। এখন ওই মহাকাশযানের পাশাপাশি যদি একটা আলোকরশ্মি একই দিকে এগোতে থাকে সেক্ষেত্রে ঐ নভশ্চর কী দেখবেন? আইনস্টাইনের হিসেব বলছে নভশ্চর দেখবেন আলোকরশ্মি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু ঐ নভশ্চর যদি একই বেগে একটা আলোর উৎসের দিকে এগোতে থাকেন তাহলে কি তিনি দেখবেন? আইনস্টাইন বলছেন এক্ষেত্রেও আলোর বেগ ঐ একই, সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। অর্থাৎ, আলোর সাপেক্ষে তিনি যেভাবেই ছুটুন না কেন, তার কাছে আলোর বেগ সবসময়েই সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। কেন? আলোর বেগ যদি তার কাছে

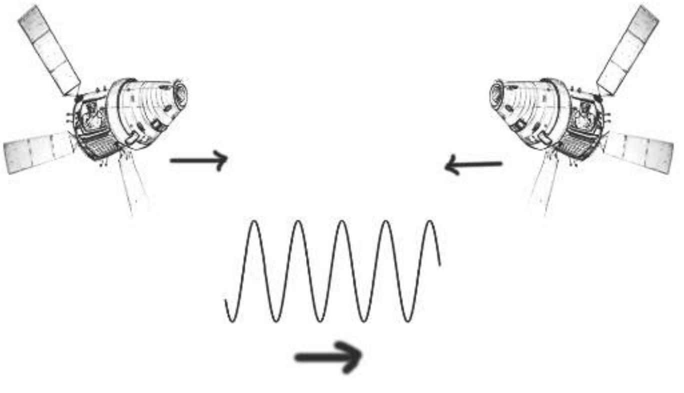

তিন লক্ষ কিলোমিটার/সেকেন্ড

কিছুটা কম বা বেশি বলে মনে হত তাহলেই তো তিনি ইথার বায়ুর অস্তিত্বটা ধরে ফেলতে পারতেন। তার মানে উল্টোদিক থেকে ভাবলে দাঁড়ায়, ইথার বায়ুর ভাবনাটাকে সরাতে পারলেই আমরা মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার ব্যর্থতার কারণটা খুঁজে পেয়ে যাব। আইনস্টাইনের দ্বিতীয় মাস্টারস্ট্রোক।

এই দুটো ভাবনাকে এক জায়গায় করেই ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন লিখলেন তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের দুটো 'মৌলিক অঙ্গীকার'—

প্রথমত, স্থির ইথারের সাপেক্ষে কোনও বস্তু স্থির অবস্থায় আছে নাকি সুষম বেগে গতিশীল, সেটা বলা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, উৎসের গতি যেমনই হোক না কেন, শূন্যস্থানে আলো সবসময়েই একই নির্দিষ্ট বেগে চলবে।

আইনস্টাইনের সমসাময়িক বেশ কয়েকজন পদার্থবিদও এরকমভাবে ভাবতে চাইছিলেন। লোরেনৎস যে ইথার বায়ুর চাপে বস্তুর দৈর্ঘ্য ও সময়ের সংকোচনের কথা বলতে চেয়েছিলেন সেখানেও তিনি এরকম দুটো অঙ্গীকারকে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ পদার্থবিদই এই ভাবনাটা সাধারণ বোধ-বুদ্ধিকে লঙ্ঘন করছে বলেই ভাবছিলেন। তাঁদের মতে অঙ্গীকারগুলোর মধ্যে কোনও সাযুজ্য নেই, যেকোনও একটাকে ভুল হতেই হবে। কিন্তু আইনস্টাইন বিষয়টাকে ভাবতে চাইলেন একেবারে অন্যভাবে। তাঁর বক্তব্য ঃ বস্তুর দৈর্ঘ্য আর সময়কে "ধ্রুব সত্য" হিসেবে ধরে নেওয়ার ভাবনাটাকে ছাড়তে না পারলে অঙ্গীকারগুলোকে সাযুজ্যহীন বলেই মনে হবে।

ব্যাপারটাকে সহজে বোঝার জন্য আইনস্টাইন নিজেই একটা কাল্পনিক পরীক্ষার কথা বলেছিলেন। ধরা যাক, একজন দর্শক M একটা

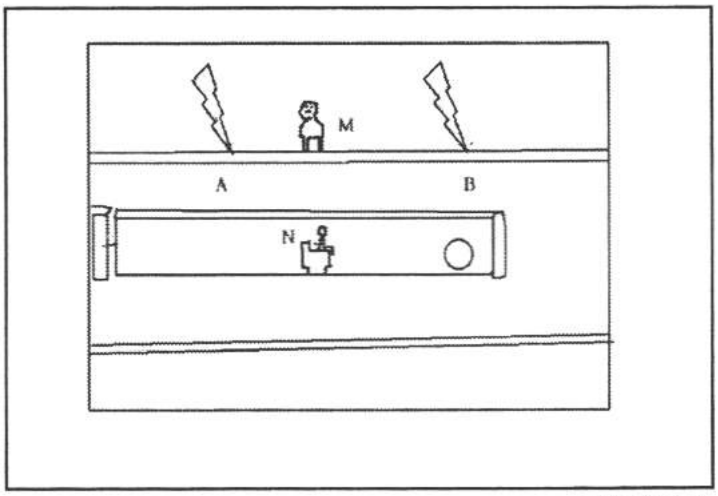

ছবি: অগ্নিপ দে

রেললাইনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তার ডানদিকে ও বাদিকে রেললাইনের উপর একই দূরত্বে দুটো বিন্দু A আর B। এই সময়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালে M দেখল A আর B বিন্দুতে একসাথে দুটো আলোর ঝলক এসে পড়ল। এই সময়েই প্রচন্ড গতিতে একটা ট্রেন পাশের লাইন দিয়ে A থেকে B-এর দিকে যাচ্ছিল। যে মুহূর্তে বিদ্যুৎ চমকালো ঠিক সেই মুহূর্তে ট্রেনের ভিতরের এক দর্শক N আর মাটিতে দাঁড়ানো

M-এর অবস্থান একই সরলরেখা বরাবর। তার মানে N, B বিন্দুর আলোর ঝলকের দিকে এগোচ্ছে আর A বিন্দুর ঝলক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল N কি ঐ ঝলকদুটোকে একসঙ্গেই দেখবে? না। আপেক্ষিক তত্ত্ব বলছে B বিন্দুর ঝলকটাকে সে আগে দেখবে, A বিন্দুর ঝলকটাকে দেখবে কিছু সময় পরে। সে যদি জানত যে সে গতিশীল অবস্থায় আছে তাহলে কিন্তু ঝলকদুটোকে সে একসঙ্গেই দেখত।

তার মানে বিদ্যুতের ঝলকদুটো একসঙ্গেই হচ্ছে কি না নিশ্চিতভাবে সেটা বলা যাচ্ছে না। উত্তরটা নির্ভর করছে কোন্ নির্দেশতন্ত্রটাকে আমরা বেছে নিচ্ছি তার উপরে। দুটো ঘটনা যদি একই বিন্দুতে একসঙ্গেই ঘটে সেক্ষেত্রে ঘটনাদুটো যুগপৎ এটা বলা সম্ভব। যেমন, আকাশে যদি দুটো প্লেনের ধাক্কা লাগে সেক্ষেত্রে যেকোন নির্দেশতন্ত্র থেকেই প্লেনদুটোর সংঘর্ষ একসঙ্গে হয়েছে বলেই মনে হবে। কিন্তু দুটো ঘটনা যদি অনেকটা দূরত্বে ঘটে সেক্ষেত্রে তারা একসঙ্গেই ঘটেছে কিনা, আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, সেটা বলা মুশকিল।

আইনস্টাইনের এই ভাবনাটা যে কতখানি বৈপ্লবিক ছিল আরও একটা কাল্পনিক পরীক্ষার সাহায্যে সেটা বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। এখানে বিরাট দূরত্ব আর অত্যন্ত দ্রুত গতির একটা ঘটনাকে আমরা ভাবনার মধ্যে আনতে চাইছি। ধরে নেওয়া যাক আমাদের ছায়াপথের যে প্রান্তে সূর্য আছে তার অন্য প্রান্তের কোনও এক গ্রহ থেকে একজন মহাকাশচারী পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছেন। তিনি একটা বেতার সংকেত পৃথিবীর দিকে পাঠালেন। বেতার সংকেত একটা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, তাই শূন্যস্থানের মধ্যে দিয়ে ঐ তরঙ্গ আলোর বেগ নিয়েই ছুটবে। ঐ গ্রহ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব দশ আলোকবর্ষ হলে ঐ সংকেত পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে দশ বছর সময় লাগবে। কিন্তু আলোর বেগে চলার জন্য ঐ সংকেতের কাছে সময় অনেক ধীর লয়ে চলবে। ফলে তার কাছে যেটা দশ বছর, পৃথিবীর মাটিতে বসে থাকা একজন দর্শকের কাছে যেহেতু তিনি স্থির বা অত্যন্ত ধীর লয়ে গতিশীল। সেটা তুলনায় অনেকটাই বেশি সময়। ধরা যাক, বারো বছর আগে পৃথিবীতে বসে একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী

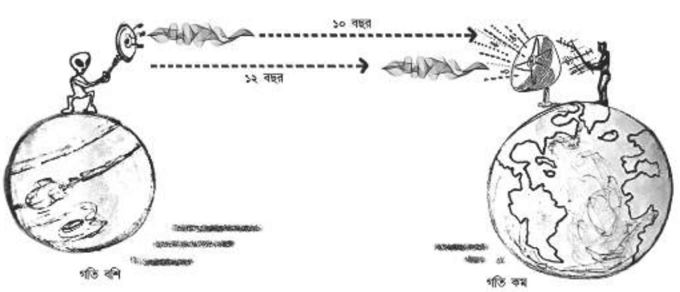

ঐ সংকেতটাকে লিপিবদ্ধ করলেন, তার জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হল। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে এই বারো বছর সময়কাল আসলে (আলোর বেগে গতিশীল) ঐ সংকেতের কাছে নয় বা আট বছরের সমান। তার মানে সংকেত এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়নি। অর্থাৎ বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বলছে দূরের গ্রহ থেকে ঐ সংকেত পাঠানোর আগেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারটা পেয়ে যাবেন।

সময়ের ব্যবধানটাকে কমিয়ে আনলে কিন্তু রেজাল্টটা অন্যরকম হবে। যদি সংকেত গ্রহণের দশ মিনিট পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটা হাঁচি দেন তাহলে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে, যেকোনও নির্দেশতন্ত্রের সমস্ত দর্শকের কাছেই, দূরের গ্রহ থেকে সংকেত পাঠানোর পরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর হাঁচি শোনা যাবে।

আরও মজা আছে। ধরুন যে দশ বছর ধরে ঐ বেতার সংকেত শূন্যস্থানের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছে সেই সময়কালের মধ্যেই, ধরা যাক পৃথিবীতে সংকেত এসে পৌঁছনোর তিন বছর আগে, জ্যোতির্বিজ্ঞানী পড়ে গিয়ে পা ভাঙলেন। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে ঐ দুর্ঘটনাটা সংকেত পাঠানোর আগে হয়েছে না পরে হয়েছে সেটা বলা যাবে না।

কেন এরকম হবে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, ঠিক যে মুহূর্তে দূরের গ্রহ থেকে বেতার সংকেত পাঠানো হয়েছে সেই মুহূর্তেই একজন মহাকাশচারী পৃথিবীর দিকে ছুটতে শুরু করলেন। পৃথিবী থেকে মনে হচ্ছে তার বেগ বেশ কম। ঐ মহাকাশচারী তার নিজের ঘড়ি অনুযায়ী সংকেত পাঠানোর বেশ কিছুটা সময় পরেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পা ভাঙতে দেখবেন। সংকেত পাঠানোর বেশ

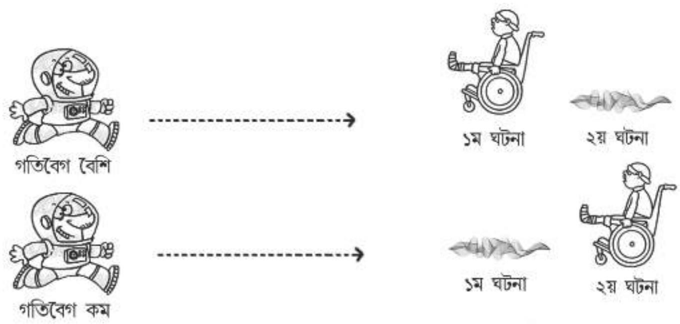

অনেকটা সময় পরে, হয়ত কয়েক শতাব্দী পরে, তিনি নিজের পৃথিবীতে এসে পৌঁছলেন। কিন্তু আরেকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী যদি সংকেত পাঠানোর মুহূর্তেই আলোর বেগের কাছাকাছি কোনও বেগ নিয়ে পৃথিবীর দিকে ছুটতে শুরু করেন, তিনি দেখবেন সংকেত পাঠানোর আগেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পা ভেঙে গেছে। পৃথিবীতে বসে হিসেব করলে দেখা যাবে ঐ মহাকাশচারীর পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে দশ বছরের কিছুটা বেশি সময় লাগবে। কিন্তু তার অত্যধিক দ্রুতগতির জন্য সময় চলবে খুব ধীর লয়ে, আর তাই তার মনে হবে তিন বছরের কিছু আগে জোতির্বিজ্ঞানীর পা ভেঙেছে; অথচ তার ঘড়ি অনুযায়ী মাত্র কয়েক মাস আগে সংকেত পাঠনো হয়েছিল। তার মানে তার হিসেবে সংকেত পাঠানোর আগেই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

আর মহাকাশচারী যদি আলোর বেগ নিয়েই পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রওনা হতেন, তাহলে তার ঘড়িটা একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। অথাৎ,

পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে তার কোনও সময়ই লাগত না। সেক্ষেত্রে সংকেত পাঠনো আর তাকে গ্রহণ করার কাজটা একসঙ্গেই ঘটত। পৃথিবীর মাটিতে এই দশ বছরে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেই সবকিছুকেই সংকেত পাঠানোর আগের ঘটনা বলে মনে হবে।

তার মানে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে আমাদের পছন্দের কোনও নির্দেশতন্ত্র থাকতে পারে না। একজনের দৃষ্টিভঙ্গীকে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গীর থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ারও কোন কারণ নেই। আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ নিয়ে গতিশীল মহাকাশচারীর হিসেব-নিকেশ যতখানি সঠিক, ধীর লয়ে গতিশীল মহাকাশচারীর হিসেব-নিকেশও ঠিক ততখানিই সঠিক। আপনি যেখানে আছেন সেই বিন্দুতে কোনও এক মুহূর্তে 'বর্তমান' কথাটার মানে থাকলেও ঐ একই মুহূর্তে বিশ্বজগতের সর্বত্র 'বর্তমান' কথাটার একই মানে দাঁড়াবে, এমনটা আর বলা যাচ্ছে না। পদার্থবিদ এডওয়ার্ড টেলারের ভাষায় বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের এটাই সবচেয়ে 'অপ্রত্যাশিত সুন্দর' বিষয়।

দর্শকের গতিবিধির উপর নির্ভর করে সময় পরিমাপের এই পরিবর্তনের ব্যাপারটা ধরতে পারলেই আমরা দেখাতে পারব বস্তুর দৈর্ঘ্যও আপেক্ষিক। একটা গতিশীল ট্রেনের শুরু আর শেষ প্রান্তটা একই মুহূর্তে ঠিক কোথায় সেটা জানতে না পারলে ট্রেনের দৈর্ঘ্য কিছুতেই মাপা যাবে না। তার মানে, একটা গতিশীল বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপতে হলে একসঙ্গে দুটো ঘটনাকে দেখার কাজটা করতেই হবে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। সুতরাং গতিশীল বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপার বিষয়টা নির্দেশতন্ত্র বেছে নেওয়ার উপরে নির্ভরশীল হয়েই পড়ছে।

ধরা যাক, দুটো মহাকাশযান একে অন্যের সাপেক্ষে গতিশীল। কোনও একটা যানের দর্শক যদি অন্য যানের দৈর্ঘ্য মাপতে চান, সেক্ষেত্রে তার মাপে দৈর্ঘ্য কিছুটা কম হবে। সাধারণ বেগের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন খুবই সামান্য। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘন্টায় তিরিশ কিলোমিটার বেগে ছুটছে। সূর্যের সাপেক্ষে স্থির কোনও দর্শকের কাছে পৃথিবীকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি ছোট বলে মনে হবে। কিন্তু বেগ যদি অনেকটাই বেশি হয়, সেক্ষেত্রে পরিবর্তনও হবে বেশ অনেকখানি। লোরেনৎস আর ফিৎসজেরাল্ড দৈর্ঘ্য সংকোচনের যে সূত্রটা বলেছিলেন এক্ষেত্রেও সে সূত্রটাই প্রযোজ্য, তাই আপেক্ষিক তত্ত্বেও একে লোরেনৎস-ফিৎসজেরাল্ড সংকোচন নামেই ডাকা হয়। কিন্তু আইনস্টাইনের ব্যাখ্যাটা ছিল অন্যরকমের। লোরেনৎস-ফিৎসজেরাল্ডের ভাবনায় দৈর্ঘ্যের সংকোচন একটা ভৌত প্রক্রিয়া, ইথার বায়ুর চাপে এই পরিবর্তনটা হচ্ছে। আইনস্টাইনের ভাবনায় এটা আসলে মাপজোকের সমস্যা। ঐ দুই মহাকাশযানের যাত্রীরা যখন নিজেদের মহাকাশযান বা যানের ভিতরের কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপবেন, তখন তারা কোনও সংকোচন দেখতে পাবেন না। শুধুমাত্র অন্য যানের ক্ষেত্রেই এই সংকোচনটা ধরা পড়বে। ইথারের গুরুত্বটাকে সরিয়ে দিয়ে পরম দৈর্ঘ্যের ধারণাটাকেই আইনস্টাইন নস্যাৎ করে দিলেন। তাঁর মতে, মেপে যে দৈর্ঘ্যটা পাওয়া যাবে সেটাই আসল, বস্তু আর দর্শকের আপেক্ষিক বেগের উপর নির্ভর করে এই মাপটাই পালটে পালটে যাবে।

কেন? তার কারণটা হল দৈর্ঘ্যের আপাত পরিবর্তনের সাথে সাথে সময়ের মাপেও যে একটা আপাত পরিবর্তন হবে। এক মহাকাশযানের দর্শক দেখবেন অন্য যানের ঘড়িটা স্লো চলছে। আরও একটা কাল্পনিক পরীক্ষার কথা বলি। প্রায় আলোর বেগ নিয়ে মহাকাশযান দুটো যখন একে অন্যকে অতিক্রম করে যাচ্ছে ঠিক সেই সময়ে একটা যানের ছাদ থেকে মেঝের দিকে একটা আলোকরশ্মি পাঠানো হল। মেঝেতে রাখা আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে ঐ রশ্মি আবার ছাদে ফিরে এল। অন্য যানের দর্শকের কাছে ঐ আলোকরশ্মি একটা V-আকৃতির পথে যাবে। ঐ দর্শক তার ঘড়িতে আলোর V-আকৃতির পথ যেতে কতটা সময় লাগল তা মাপলেন। মোট দূরত্বকে মোট সময় দিয়ে ভাগ করলেই তিনি আলোর বেগ পেয়ে যাবেন।

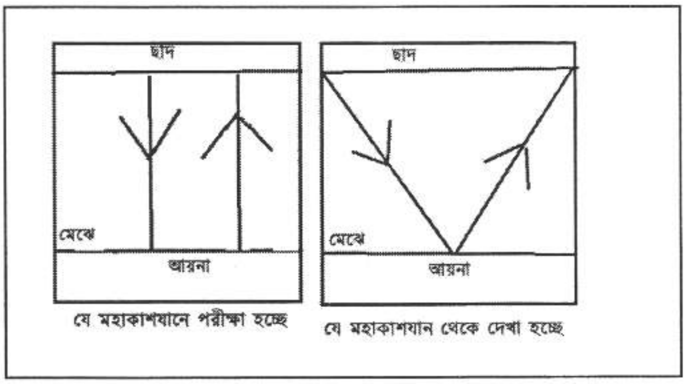

ছবি: অগ্নিপ দে

কিন্তু পরীক্ষাটা যেখানে হচ্ছিল সেই মহাকাশযানের দর্শক ঐ আলোকরশ্মিকে সোজা পথে একবার নামতে আর একবার উঠতে দেখবেন। এক্ষেত্রে মোট দূরত্ব কিছুটা কম হবে। তার নিজের ঘড়ি অনুযায়ী এই দূরত্বটা যেতে আলোর যে সময় লাগবে সেই সময় দিয়ে ঐ দূরত্বটাকে ভাগ করলেই তিনি আলোর বেগ পেয়ে যাবেন। কিন্তু আলোর বেগ তো সব দর্শকের কাছেই সমান, সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। তিনিও তা-ই মাপবেন।

কীভাবে হল? নিশ্চয়ই তার ঘড়িটা স্লো চলছে। পরীক্ষাটা যদি অন্য যানে করা হত তাহলেও ব্যাপারটা একই হত।

সনাতন পদার্থবিদ্যার খোল-নলচে বদলে দিয়ে আপেক্ষিক তত্ত্ব তাই ঘোষণা করল—দৈর্ঘ্য আর সময় দুটোই আপেক্ষিক। বস্তুর সাথে দর্শকের সম্পর্ক ছাড়া এর কোনও অর্থই নেই। আবার একটা পরিমাপ "সঠিক" আর অন্যটা "ভুল", একথারও মানে নেই। যে-দর্শক মাপজোকের কাজটা করছেন তার সাপেক্ষে, তার নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষে, সবকিছুই সঠিক। সেটা দৃষ্টিবিভ্রমও নয়, মনস্তাত্ত্বিকের চুলচেরা বিশ্লেষণের উপজীব্য কোনও বিষয়ও নয়। এইখানেই 'আইনস্টাইন বিপ্লব'।

email:anindya05@gmail.com • M. 9432220412

জ য় দে ব দে

ছোট মাছ, না বড় মাছ?

'৮৭ সাল। জুন মাস। বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সকাল ৭টা থেকে সারাদিনের কর্মসূচী। পরিবেশ সচেতনতা। পুস্তিকা নিয়ে ট্রেনে প্রচার।

পরিবেশকে নির্মল ও দূষণমুক্ত রাখার আবেদন জানিয়ে ট্রেনে ও স্টেশনে পুস্তিকা, লিফলেট ও পোস্টার প্রদর্শনী ও প্রচার। সিদ্ধান্ত ছিল রানাঘাটে মাসির হোটেলে দুপুরে মাছ ভাত খাওয়া হবে। মাসির হোটেলে যেতেই শঙ্কর বলল সে বড় মাছ খাবে। বাকিরা চেঁচিয়ে উঠল, না, ছোট মাছ খাব। ব্যস তুমুল ঝামেলা শুরু হল। আমাদের মধ্যে বড় একজন জানাল যে আচ্ছা, আজ যেমন খুশি অর্থাৎ ছোট বা বড় মাছ খেতে পারো।

তারপর থেকে জানার আগ্রহ ভীষণ বেড়ে গেল। কোন মাছ খাওয়া সবচেয়ে ভালো। ছোট মাছ, না বড় মাছ?

আজকের এই প্রবন্ধে মাছের গুণাগুন নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন থাকবে। জ্যান্ত মাছ না মরা মাছ? শুঁটকি মাছ মানেই কি পচা মাছ? লাল কানকো মানেই কি ভালো মাছ? বাসি মাছ শরীরে কতটা ক্ষতি করে? মৃগেল মাছ থেকে মৃগী হয়? হাইব্রিড মাগুর-শিঙ্গি, না দেশি শিঙ্গি মাগুর? এসব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব।

দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছ প্রায় অপরিহার্য। আমাদের রাজ্যে ১০০-এরও বেশি মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বেশির ভাগই ছোটমাছ। হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি বড় মাছ। বড় মাছ যেমন, রুই, কাতলা, আড়, বোয়াল, মৃগেল, ভেটকি বা ইলিশ। বিয়ে বাড়ি বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে বড় মাছই পাতে দেওয়া হয়। অথচ পুষ্টি মূল্যের বিচারে [টেবিলে দেখুন] ছোট মাছই বেশি পুষ্টিকর। বিশ্বস্বাস্থ্যসংস্থা জানিয়েছেন প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১৪০-২৮০ গ্রাম মাছ খাওয়া দরকার। সামুদ্রিক মাছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সহ অন্যান্য উপাদান থাকে। তাই খাদ্যতালিকায় সামুদ্রিক মাছ রাখা দরকার।

বাটা, খয়রা, কই, শিঙ্গি, ল্যাটা, ফলুই, খলসে মৌরলা, বেলে ট্যাংরা প্রভৃতি ছোট মাছে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন সহ বিভিন্ন পুষ্টির উপাদান অনেক বেশি থাকে। তুলনামূলকভাবে বড় মাছে পুষ্টিমূল্য অনেক কম থাকে। তাছাড়া ছোটমাছ কাঁটা বেছে না খেয়ে আমরা পুরোটাই চিবিয়ে খাই, ফলে ওই কাঁটার মাধ্যমে বাড়তি খনিজ হিসেবে ক্যালসিয়াস, ফসফরাস ও লোহা শরীরে ঢোকে। বড় মাছের ক্ষেত্রে মাছের কাঁটা বেশির ভাগটাই আমরা ফেলে দিই।

জ্যান্ত মাছ, না মরা মাছ? কোনটা খাবেন?

জ্যান্ত মাছ বা সদ্য মরা মাছ, এদের মধ্যে খাদ্যগুণের কোন তফাত থাকে না। সদ্য মরা এবং বাসি বা পচা মাছের পার্থক্য বুঝতে না পারার জন্য অনেকেই জ্যান্ত মাছ কিনে নিয়ে বাড়ি যান।

টাটকা মাছ আর বাসি মাছ, এদের খাদ্যগুণের অনেক তফাৎ হবে।

মাছ প্রোটিন প্রধান খাদ্য। বড়মাছে ফ্যাট বেশি থাকে। কার্বোহাইড্রেট কম থাকে।

মাছ যত বাসি হতে থাকবে, ততই তার ফ্যাট অক্সিজেনের প্রভাবে বিষাক্ত হয়ে পড়বে। একটা উৎকট গন্ধই তৈরি হয়। ট্রাই মিথাইল অ্যামাইনো অক্সাইড নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ এই গন্ধের জন্য দায়ী।

শুটকি মাছের কি কোন খাদ্যগুণ নেই?

শুটকি মাছ আসলে শুকনো করা মাছ। শুকনো করা মাছে প্রোটিন অক্ষুন্ন থাকা উচিত। কিন্তু শুটকি মাছে গন্ধ হয়ে কেন?

বিভিন্ন মাছের পুষ্টিগুণ

(প্রতি ১০০ গ্রামে)

মাছের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম প্রতি ১০০ গ্রামে	ফসফরাস (মিগ্রা)	আয়রন	কার্বোহাইড্রেট	ফ্যাট	ক্যালরি
ইলিশ	১১.৮	১৮০	১৮০	২.১	২.৯	১৯.৪	২৭৩
রুই	১৬.৬	৬৮০	১৫০	০.৯	৪৪	১.৪	১৭
কাতলা	১৮.৬	৫১০	২১০	০.৮	৩.৭	১.৯	১০৬
ভেটকি	১৭.৩	৫৩০	৪০০	১.০	১.২	১.১	৭৩
বোয়াল	১৫.৪	১৬০	৪৯০	০.৬	৭.৬	২.৭	১১৬
আড়	১৫.৯	৩৮০	১৮০	০.৭	৩.৫	১.৩	৮৯
চিংড়ি	১০.৫	৯০	২৪০	০.৮	০	.৯	৯০
পুটি	১৮.১	১২০	৯৬	১.০	৩.১	২.৪	১০৬
বাটা	১৪.৩	৭৯০	২৫০	১.১	২.২	২.৫	৮৯
খয়রা	১৮.০	৫৯০	২২০	০.৭	৫.২	৩.০	১২০
কই	১৪.৮	৪১০	৩৯০	১.৪	৪.৪	৮.৮	১৫৬
মাগুর	১৫.০	২১০	২৯০	০.৭	—	—	৮৬
শিঙ্গি	২২.৮	৬৭০	৬৫০	২.২	—	.৬	৯৬
শোল	১৬.৩	—	—	—	১.৩	২.৩	৮৫
ল্যাটা	১৯.৪	৬১০	৮৩০	১.৩	—	.৬	৭৩
মৌরলা	১৮.০	৮৫০	২৫০	০.৭	২.৬	১.১	১১৯
ট্যাংরা	১৯.২	২৭০	১৭০	২.১	০	৬.৪	১৩৪
ফলুই	১৯.৮	৫৯০	৪৫০	১.৭	১.০	১.০	৮২
খলসে	১৬.১	৪৬০	৩৬০	০.৯	৩.১	৩.৯	১১২
মৃগেল	১৯.৫	৩৫০	২৮০	১.৯	—	—	—
পাবদা	১৯.২	৩১০	২১০	১.৩	৪.৬	২.১	১১৪
বেলে	১৪.৫	৩৭০	৩৩০	১.০	২.৯	.৬	৭৫

আসলে মাছ যদি ঠিক মতো শুকনো করা হয়, তা হলে গন্ধ আসবে না। ধরা মাছ সঙ্গে সঙ্গে শুকনো করা হয় না। পুরো রোদ না পাওয়া গেলে ১ দিনের বদলে ৫ দিন লেগে যেতে পারে। ফলে মাছ শুকনোর আগেই মাছ বাসি হতে থাকবে। আস্তে আস্তে গেঁজিয়ে উঠবে। এর ফলেই গন্ধ আসে। শুকনো করার পরেও গন্ধটা একেবারে চলে যায় না। যদিও বিদেশে সিল করা টিনের কৌটোয় মাছ কেনা-বেচা হয়। সেক্ষেত্রে খাদ্য গুণ ঠিক থাকে।

লাল কানকো হলেই কি ভালো মাছ?

কানকো লাল দেখে আমরা অনেকেই মাছ কিনি। বাসি বা পচা মাছের কানকো ফ্যাকাসে হয়ে যায়। বাজারে কঙ্গো রেড (Congo red বা খুনি লাল রঙ) দিয়ে মাছের কানকো লাল করা হয়। এইরঙটি একটি অ্যাসিড ডাই। খাদ্য তালিকায় এই রঙটি আদৌ অনুমোদিত নয়। মাছে যেহেতু প্রোটিন থাকে, তাই এই রঙটিকে খুব শক্তভাবে ধরে রাখে। তাই সহজে হাত দিয়ে ঘষে বা জলদিয়ে ধুয়ে দূর করা যায় না।

বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা যায়, রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিশ ভেটকি প্রভৃতি মাছের ৩০০টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৪৫টি ক্ষেত্রে লাল রঙ হিসেবে কঙ্গো রেড দেওয়া হয়েছে।

বড় মাছের পেটের দিকে পায়ু থাকে। টাটকা মাছে এই পায়ুর রঙ লালচে আভাযুক্ত হবে। বাসি বা পচা মাছে লালচে আভা থাকবে না।

অনেকক্ষেত্রে ফরম্যালডিহাইড দ্রবণের সাহায্যে নরম বা বাসি

বা পচা মাছকে টাটকা করা হয়। এক্ষেত্রে মাছটি বেশ শক্ত হয়ে যাবে। চোখ একেবারে ফ্যাকাসে দেখাবে বা ভিতরের দিকে ঢুকে থাকবে। এ ধরনের মাছ খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

★ মাছ নিয়ে একটি ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে রয়েছে। যেমন মৃগেল মাছ খেলে মৃগী হয়। মৃগী রোগের সঙ্গে মৃগেল মাছের কোন সম্পর্ক নেই। মৃগী একটি স্নায়ু ঘটিত রোগ।

★ হাইব্রিড শিঙ্গি, মাগুর এবং দেশি শিঙ্গি, মাগুর-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হাইব্রিড মাছ খুব দ্রুত বাড়ে। আকারে বড় হয়। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্রের জন্য শিঙ্গি, মাগুর কই প্রভৃতি জিওল মাছ কম অক্সিজেন ও কম জলে অনেকক্ষণ বাঁচতে পারে।

মাছের উপকারিতা

১. হৃদরোগ প্রতিরোধ করে। মাছের ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড-এর মাত্রা কমায়। এর ফলে লিভারের রোগ হ্রাস পায়। পাশাপাশি মস্তিষ্কের রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।
২. মাছ ও মাছের তেল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পাশাপাশি সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে।
৩. মাছে যেহেতু ভিটামিন ডি পাওয়া যায়, তাই মাছের ক্যালসিয়াম শোষন (absarption) আমাদের শরীরে বেশি হয়। এর ফলে শরীরের হাড় ও পেশির গঠন ও বৃদ্ধি ভালো হয়।
৪. অ্যালজাইমার রোগের (স্মৃতি শক্তি হ্রাস) ঝুকি কমায়।
৫. চোখের দৃষ্টিশক্তি ও চোখের ওপরে জলের পরিমাণ ঠিক রাখতে সাহায্য করে।
৬. চামড়ায় Adult Acne বা hormonal Acne যাদের আছে, তাদের ক্ষেত্রে মাছ খাওয়া প্রয়োজন। মাছের ত্বকে ভিটামিন ই ও কোলাজেন থাকে। এরা ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে খুব উপকারী। তাই খাবারের তালিকায় মাছের ত্বক (ফিস স্কিন) রাখা দরকার।
৭. মাছের তেল উচ্চ রক্ত চাপ কমাতে সাহায্য করে। Muscle Regeneration (পেশি পুর্নগঠনে) এ সাহায্য করে।
৮. অ্যাথলেটস্ দের ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে (Fatigue recovery) -তে সাহায্য করে।

email:deyjoydev1964@gmail.com • M. 9474330092

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

অ নি ন্দ্য দে

তরলের মোচড়

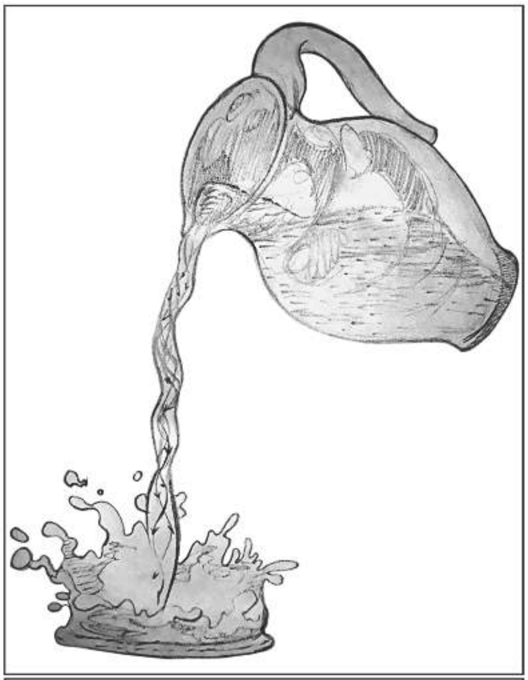

পাত্র থেকে তরল ঢালার সময় তরলের ধারাটা যে মুচড়ে যেতে চায় সেটা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন। বলতে পারেন কেন এরকম হয়? আসলে যেকোন পদার্থই লক্ষ কোটি অনুর সমবায়। তরল পদার্থের ক্ষেত্রে এই অনুগুলো একে অন্যের সাথে খুব আলগাভাবে লেগে থাকে। পাত্র থেকে তরল ঢালার সময় এই অনুগুলো তরলের ধারা বেয়ে একের পর এক নেমে আসতে থাকে। অভিকর্ষের টানে যখন একটা অনু নীচের দিকে নামতে থাকে তখন তার বেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু তখনও সে আসঞ্জন বলের টানে আশেপাশের কিছু অনুর সাথে লেগে থাকতে চায়। বিপরীতমুখী হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই আসঞ্জন বল আর অভিকর্ষ একই রেখা বরাবর কাজ করে না। আর তার ফলেই এই মোচড়ের সৃষ্টি। যে অনুগুলো আগে নেমে আসে তারা যত নীচে নামে ততই তাদের বেগ বাড়তে থাকে। খুব কাছাকাছি থাকা অনুগুলোর বেগও যথেষ্ট আলাদা হয়।

আবার যেকোন বস্তুকে ঘোরাতে হলে, যেমন একটা কলের ট্যাপ খোলা বা বন্ধ করার ক্ষেত্রে, দুটো বল পরস্পর বিপরীত দিকে প্রয়োগ করতে হয়। পাত্র থেকে তরল ঢালার সময়ে তরলের ধারার ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা হয়। বিপরীতমুখী অভিকর্ষ আর আসঞ্জন বলের প্রভাবে অনুগুলো ঘুরতে শুরু করে। তার ফলেই মোচড়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বেগ আলাদা আলাদা হওয়ার জন্য মোচড়টা সবার উপর সমান মানে হয় না। তাই তরল কিছুটা ছিটকে পড়ার উপক্রমও হয়।

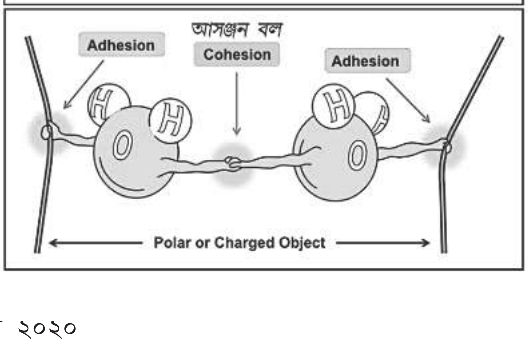

বাজি ও করোনা

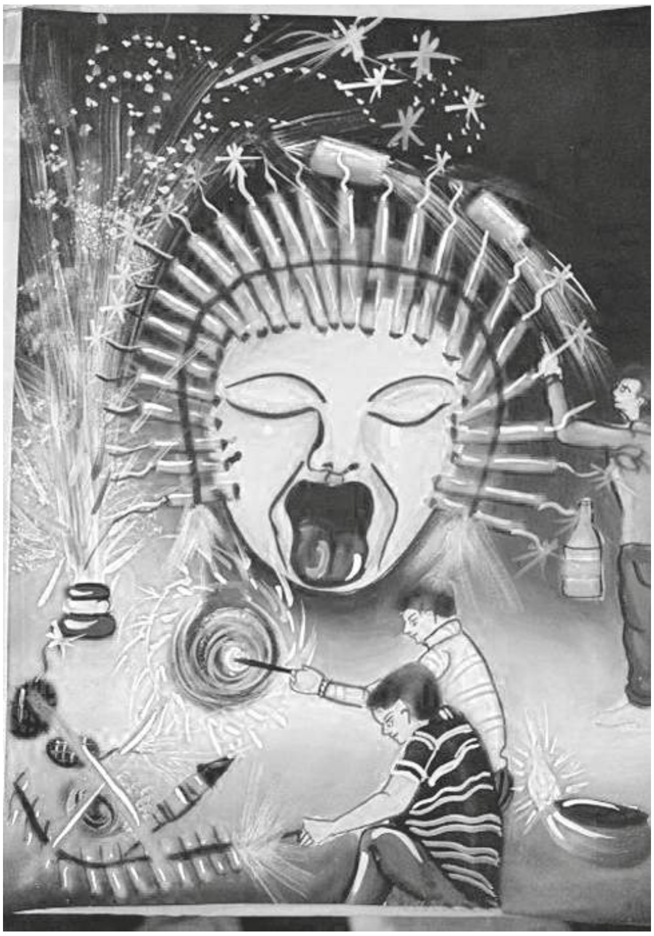

বাজি পোড়ানো নিয়ে বিতর্ক চলছে গত দু-তিন দশক যাবৎ, যদিও বাজির ইতিহাস যথেষ্ট পুরনো---চিনে দু-হাজার বছরের বেশি, ভারতবর্ষে প্রায় সাতশো বছর, যখন বারুদের প্রচলন হল। বাজি পোড়ানোর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমার সূচনা শব্দ নিয়ে। পরবর্তী সময়ে বায়ুদূষণের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত ফুসফুস ও কার্ডিও -ভাস্কুলার রোগের প্রাবল্য এবং এর স্বপক্ষে একরাশ পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ বাজি-দূষণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বাজি-দূষণের সঙ্গে উৎসবের বড়ই সু-সম্পর্ক। উৎসবের আনন্দবর্ধনের এক নিদারুণ প্রক্রিয়া হল উৎকট শব্দ সৃষ্টি। আলোর ফুলকি, আলোর বিচ্ছুরণ, আলোকমালা ও রঙ-বেরঙের আলোর ডিজাইন অবশ্যই নয়নাভিরাম। কিন্তু বাজি যদি তার উৎস হয়, তাহলে এই আলো আর বিকট শব্দের অপরিহার্য সহচর হিসাবে চলে আসে প্রবল বায়ুদূষণ। বাজি পোড়ানোর উপকরণ হল নানাপ্রকারের রাসায়নিক—কিছু সৃষ্টি করে শব্দ, আর কিছু সৃষ্টি করে আলোর বাহার—যেমন অঙ্গারকণিকা, সালফার, ফসফরাস, সোডিয়াম নাইট্রেট, পটাসিয়াম ক্লোরেট ও পারক্লোরেট এবং বেশ কিছু বিষাক্ত ধাতু। এর মধ্যে থাকে লিথিয়াম, স্ট্রনসিয়াম (যা থেকে লাল রং-এর স্ফূরণ হয়), বেরিয়াম (সবুজ আলো), তামা (নীল আলো), অ্যালুমিনিয়াম (শ্বেতশুভ্র, তীব্র ঔজ্জ্বল্য), আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম, সীসা এবং আরো অনেক কিছু। বাজি পোড়ানোর সময় স্বাভাবিকভাবে নির্গত হয় এই সব ধাতুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকা—যা অতীব বিষাক্ত, অঙ্গার কণিকা, সূক্ষ্ম ধূলিকণা (বিজ্ঞান পরিভাষায় যা PM ১০ এবং PM ২.৫ নামে পরিচিত) এবং প্রভূত পরিমাণ বায়বীয় দূষক, যেমন সালফার, ফসফরাস ও নাইট্রোজেন অক্সাইড, অতি বিষাক্ত জৈবযৌগ এবং আরো অনেক কিছু। রোগ এবং রোগীর উপর রয়েছে এর অপরিহার্য এবং মারাত্মক প্রভাব।

বর্তমান সময়ে জনজীবনে ও জীবনযাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিপুল অবদান একদিকে যেমন আমাদের এক কল্পলোকের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিকে এসেছে অনেক না-জানা সমস্যা। প্রাদুর্ভাব হয়েছে নানা রোগের-যার সামনের সারিতে রয়েছে বিভিন্ন ভাইরাস-ঘটিত রোগ, যার চূড়ায় স্থান করে নিয়েছে কোভিড-১৯। এর পছন্দের আক্রমণস্থল হল ফুসফুস ও শ্বাসনালী। যথারীতি বায়ুদূষণ হয়ে উঠেছে কোভিড-এর প্রাণসখা। প্রমাণ? কোভিড অতিমারীর প্রথম দিকেই হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল এবং T. H. Chan স্কুল অফ পাবলিক হেলথ্-এর এই বছর এপ্রিল মাসে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রবন্ধে বলা হল মানহাট্টান-এ সূক্ষ্ম ধূলিকণা প্রতি ঘনমিটারে এক মাইক্রোগ্রাম কম হলে কোভিড-এ মৃতের সংখ্যা ২৪৮ কমে যেত। এটি পরীক্ষালব্ধ তথ্য, আনুমানিক নয়। অতি সম্প্রতি ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি-র জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধে বলা হয়েছে বায়ুদূষণে বিশ্বে কোভিড মৃত্যু বেড়েছে শতকরা ১৫ ভাগ, পূর্ব-এশিয়াতে যা শতকরা ২৭ ভাগ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অক্টোবর ২৩-এর এক আলোচনায় একই সতর্কবার্তা জানানো হয়েছে।

গত তিন-চার মাসে প্রকাশিত কিছু গবেষণায় বলা হয়েছে বায়ুদূষণ কোভিড-এর প্রসার অনেকটাই ত্বরান্বিত করে। কোভিড আক্রান্ত ব্যক্তির নাক-মুখ থেকে নির্গত ভাইরাস-নিষিক্ত লালা-কণা বাতাসের ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ধাবমান হয় এবং অনতিবিলম্বে বিনা বিচারে সম্মুখস্থ মানবদেহে আতিথ্যগ্রহণ করে। বাজি পোড়ানোর ফলে বাতসে ধূলিকণা এবং অন্যান্য দূষকের প্রভূত বৃদ্ধি পরীক্ষিত সত্য। সূক্ষ্ম ধূলিকণা—যা কোভিড-এর প্রাণের বন্ধু, প্রায় চল্লিশ গুণ বেড়ে যাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। ধূলিকণা ছাড়াও বিষাক্ত ধাতুকণা যে কোভিড-এর প্রভাবকে যে আরো ধ্বংসাত্মক করে তুলবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ইতিমধ্যে কিছু রাজ্য বাজি নিষিদ্ধ করেছে। আদালত এই বিষয়ে উপযুক্ত মনোভাব গ্রহণ করেছে, আঠারোটি রাজ্যের বক্তব্য তলব করেছে। আশা করা যায় বাজি পুড়িয়ে উৎসব শব্দময় ও বর্ণময় করার এই জন নিপীড়নের এবং রোগীর যন্ত্রণা আরো দুঃসহ করার অমানবিক অভ্যাস অনতিবিলম্বে অতীতের ঘটনায় পর্যবসিত হবে। এর সাথে হ্রাস পাবে কোভিড সংক্রমণ এবং মৃত্যুর হার।

পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (PASE) কর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রচারিত

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

সূচকীয় হারে বৃদ্ধি

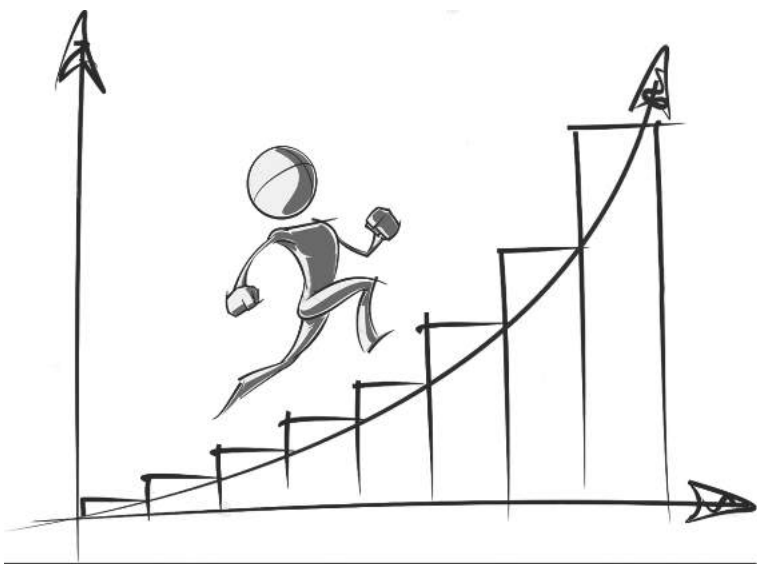

'সূচকীয় হারে বৃদ্ধি' বা exponential এই শব্দ-বন্ধের সঙ্গে বিজ্ঞান পড়ুয়া প্রতিটি ছাত্রের পরিচয় আছে। অবশ্য শুধু বিজ্ঞানের কথা বললে বিষয়টা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বহু শিক্ষিত মানুষের মুখেই আজকাল শোনা যায় এই শব্দ-বন্ধ। কেবল মুখের কথাতেই নয়, গোটা বিশ্ব জুড়ে লেখা রিপোর্টেও exponential শব্দটির ব্যবহার বেড়ে চলেছে বিগত কয়েক দশক ধরেই। একটা সংখ্যাতত্ত্বের দিকে নজর রাখলে হয়ত ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার হবে। নিউইয়র্ক টাইমসের মত বিখ্যাত পত্রিকায় সত্তরের দশকে এই শব্দটি ব্যবহার হয়েছে ১০৫ বার, আশির দশকে ২৭৯ বার, নব্বইয়ের দশকে ৬০৪ বার, নতুন শতাব্দীর প্রথম দশকে ১৩৭৫ বার এবং দ্বিতীয় দশকে এখনো পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বারের কাছাকাছি। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের (আরও ভাল করে বললে গণিতের) নিরিখে এই প্রয়োগ যথাযথ ভাবে করা হয়নি। একেবারে বিশুদ্ধ গণিতে ব্যবহৃত একটি শব্দ কী করে যে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল! আচ্ছা, বলুন তো যদি censor, critic, executive বা epidemic সংবাদ মাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত এই শব্দগুলিকে বিশুদ্ধ গণিতের কোনও চর্চায় ব্যবহার করলে কেমন হত? এই লেখার বিষয় হিসেবে এসব তথ্য অবশ্য ধান ভানতে শিবের গীত। শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য বাদ দিয়ে বরং exponential-এই ফিরে যাওয়া যাক।

সূচকীয় হারে বৃদ্ধি বা exponential growth বলতে বারংবার একই অনুপাতে বৃদ্ধিকে বোঝায়। ধরা যাক দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি, অর্থাৎ

১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২, ৬৪...

তিনগুণ হারে বৃদ্ধি হলে সংখ্যাগুলি হত

১, ৩, ৯, ২৭, ৮১, ২৪৩, ৭২৯...

এক শতাংশ হারে বৃদ্ধির কথা বললে সংখ্যাগুলি হবে

১, ১.০১, ১.০২০১, ১.০৩০১, ১.০৪০৬, ১.০৫১০১, ১.০৬১৫২...

সংখ্যার এই সারণিগুলিকে গণিতের নিয়মে আমরা লিখতে পারি

$২^{০}$, $২^{১}$, $২^{২}$, $২^{৩}$, $২^{৪}$, $২^{৫}$, $২^{৬}$...

$৩^{০}$, $৩^{১}$, $৩^{২}$, $৩^{৩}$, $৩^{৪}$, $৩^{৫}$, $৩^{৬}$...

$১.০১^{০}$, $১.০১^{১}$, $১.০১^{২}$, $১.০১^{৩}$, $১.০৪^{৪}$, $১.০৫^{৫}$, $১.০১^{৬}$...

উপরের সারণিতে প্রতিটি সাধারণ আকারের সংখ্যার ঘাড়ে বসে থাকা ছোট্ট সংখ্যাগুলিকে বলা হয় exponent বা সূচক। এই সূচক নির্ধারণ করে সেই অবস্থানে থাকা রাশিটিকে পেতে হলে সাধারণ আকারের সংখ্যাটি ঠিক কতবার গুণ করতে হবে। উপরের প্রতিটি সারণির এই বৃদ্ধিকেই বলে exponential growth। প্রতিটি নতুন সংখ্যা আগেরটি থেকে সূচকীয় হারে বাড়তে থাকে। সংখ্যা যত বড় হতে থাকে বৃদ্ধির হারও তত দ্রুত হয়। এইভাবে চলতে চলতে কিছুক্ষণ পরেই পাওয়া যায় বিশালাকার সব সংখ্যাদের।

এবার একটা বাস্তব উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করে দেখি। মনে করা যাক একটি বড় কাগজ নিয়ে আপনি ভাঁজ করতে বসেছেন। কাগজটি একেবারেই সাধারণ মানের। অর্থাৎ আমরা যে কাগজে লেখালিখি করি ঠিক সেই রকম। এই ধরনের কাগজ তো আর খুব মোটা হয় না, ধরা যাক এটা ০.১ মিলিমিটার পুরু। তাহলে প্রতিবার ভাঁজ করার ফলে কাগজের পুরুত্ব দ্বিগুণ হারে বাড়বে; অর্থাৎ মিলিমিটার এককে সংখ্যার সারণিটি হবে

০.১, ০.২, ০.৪, ০.৮, ০.১৬, ৩.২, ৬.৪...

প্রতিবারের ভাঁজে কাগজটি যত মোটা হচ্ছে ভাঁজ করতেও তত বেশি শক্তি দরকার হচ্ছে। দেখা যাবে সপ্তম বারে এসে সেই কাগজটিকে দেহের শক্তিতে ভাঁজ করে ফেলা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কারণ এবার কাগজটি প্রাথমিক অবস্থার তুলনায় ১২৮ গুণ মোটা হয়ে গেছে। আরেকবার ভাঁজ করলেই ২৫৬ পৃষ্ঠার একটি বইয়ের সমান মোটা হয়ে যাবে। ধরা যাক তবুও এই কাগজ ভাঁজের কাজটি আপনি চালিয়ে গেলেন, বাস্তবে না পারলেও ভেবে নিন অন্তত খাতাকলমে কাজটি চালিয়ে যাওয়া হল। আরও ছবার ভাঁজ করার পর কাগজটি প্রায় এক মিটার পুরু হয়ে যাবে। আরও ছবার ভাঁজ করলে উচ্চতা দাঁড়াবে মোটামুটি ৫০ মিটার। তখনও এই ভাঁজ করে যাওয়ার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন আপনি। আরও ছবার ভাঁজ করলে কাগজটি আকাশের দিকে তিন কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। সাধারণ কাগজ ভাঁজ করে দ্বিগুণ মোটা করার কাজটি চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছিল। এইভাবে ৪২ বার ভাঁজ করতে পারলেই আমাদের সেই কাগজ উচ্চতার নিরিখে পৌঁছে যাবে চাঁদে, আর ৯২তম ভাঁজে কাগজের উচ্চতা আমাদের চেনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তে গিয়ে ঠেকবে।

অ্যালবার্ট বার্টলেট নামে আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন যিনি ২০১৩ সালে নব্বই বছর বয়সে প্রয়াত হন। এই মানুষটি দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে Arithmetic, Population and Energy শিরোনামে দেশেবিদেশে ১৭৪২ টির বেশি লেকচার দিয়েছিলেন। Exponential growth বোঝাতে গিয়ে বিচিত্র সব তুলনা ব্যবহার করতেন তিনি। একবার বার্টলেট ব্যাকটেরিয়ার

বৃদ্ধিকে সূচকীয় হারে বর্ণনা করতে চাইলেন। বিষয়টা অনেকটা এইরকম। মনে করা যাক একটি বোতলে রাখা ব্যাকটেরিয়ারা প্রতি মিনিটে সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং এই হিসেবে যদি সকাল ১১ টায় বোতলটিতে একটি ব্যাকটেরিয়া রেখে দিয়ে এক ঘন্টা অপেক্ষা করা হয় তাহলে ঠিক বেলা বারেটা নাগাদ বোতলটি ব্যাকটেরিয়ায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এবার গোটা ঘটনাটির দিকে আবার ফিরে দেখা যাক। ১১.৫৯ টায় বোতলটি নিশ্চই অর্ধেক পূর্ণ হয়েছিল এবং আরও এক মিনিট আগে অর্থাৎ ১১.৫৮ টায় পূর্ণ ছিল এক চতুর্থাংশ। অর্থাৎ ১১.৫৫ টায় কিন্তু মনে হচ্ছিল বোতলটি মোটামুটি ফাঁকা, কারণ তখনো মাত্র $\frac{ত}{তত}$ অংশ ব্যাকটেরিয়ায় পূর্ণ ছিল, অর্থাৎ বোতলের প্রায় ৯৭ শতাংশই তখন ফাঁকা। তাহলে শেষ পাঁচ মিনিটেই এই বিপুল পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া তৈরি হয়েছিল। এইভাবে বাড়তে থাকলে বোতলের আয়তন ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলতেও কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। যদি কোনও শহরের জনসংখ্যা বছরে ৬% হারে বাড়তে থাকে তাহলে এক বছর পর লোকসংখ্যা হবে প্রাথমিকের ১.০৬% গুণ, দ্বিতীয় বছর $(১.০৬)^২$। সাধারণ ভাবে ৬% এমন কিছু বেশি না শোনালেও এই হারে চলতে থাকলে দু-দশকের মধ্যেই জনসংখ্যা ২০০০০ থেকে ৬৭০০০-এ পৌঁছে যাবে। এবার ভেবে দেখুন পরের বৃদ্ধিগুলো কী সাংঘাতিক দ্রুততায় ঘটতে থাকবে। অথচ খাদ্য, অর্থ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদার যোগান সেই অনুপাতে বেড়ে উঠবে কী? আমাদের পৃথিবীটার অবস্থাও কিন্তু অনেকটাই তাই। পঞ্চাশ বা পঁচাত্তর বছর আগেও জনসংখ্যা বা বিভিন্ন চাহিদার বৃদ্ধি নিয়ে কারো কোনও মাথা ব্যাথা ছিল না।

সূচকীয় হারে বৃদ্ধির সমস্যা বোঝাতে পঞ্চদশ শতকের ইতালিয় গণিতজ্ঞ লুকা প্যাচওলি (Luca Pacioli) তাঁর লেখা Summa de Arithmetica বইতে Rule of 72-এর কথা বলেছেন। কোনো কিছু সূচকীয় হারে বাড়তে থাকলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এই বাহাত্তুরে নিয়ম অনুযায়ী বিচার্য ক্ষেত্রের কোনও পরিমাণ নির্দিষ্ট সময়ে x শতাংশ হারে বাড়তে থাকলে দ্বিগুণ হতে লাগবে সেই নির্দিষ্ট সময়ের মোটামুটি   টি পর্যায়। তাই বছরে ৬% হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে মাত্র   = ১২ বছর। এই দ্বিগুণ ব্যাপারটা বরং সাধারণের বোঝার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক।

এইরকমই এক সূচকীয় বৃদ্ধির জন্য $y = a^x$ সমীকরণের অবস্থাটা দেখা যাক। এখানে x ও y পরিবর্তনশীল রাশি এবং a একটি ধনাত্মক সংখ্যা। চিত্রে x এর সঙ্গে y এর মানের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। এখানেও বোঝা যাচ্ছে x এর মান বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে y এর মান কি দ্রুত বাড়তে থাকে। তবে গণিতের ছাত্ররা a^x রাশিটিকে অনেক সময় e^{kx} হিসেবে লিখতে বেশি পছন্দ করেন। এখানে k একটি ধনাত্মক সংখ্যা। এই হিসেবে $y = 2^x$ সমীকরণটিকে লেখা যায় $y = e^{0.693x}$, তেমনি $y = 3^x$ সমীকরণটিকে লেখা যায় $y = e^{1.099x}$। তাহলে দেখা যাচ্ছে সূচকীয় বৃদ্ধিতে e খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সূচকীয় সমীকরণ লেখা থেকে শুরু করে গাণিতিক হিসাবনিকাশে একধরনের সাধারণ অবস্থা সৃষ্টিতে জরুরী এই exponential constant বা সূচকীয় ধ্রুবক e। গণিত চর্চায় খুব গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি রাশি হল ০, 1, e, i এবং π। স্কুলে পাঠ্য বইয়ে প্রথম যে অমূলদ (irrational) ধ্রুবকটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে সেটি হল π, যা আসলে কোনো বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত। এর মান মোটামুটিভাবে ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯। গণিতে কোনও রাশির মান আবার মোটামুটি হয় নাকি? হয়, যেমন এখানেই দশমিকের পর হাজার হাজার ঘর পর্যন্ত করে গেলেও এর কোনও শেষ বা পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নেই। এ হল অমূলদ সংখ্যা, তাই দুটি পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত অর্থাৎ   হিসেবে একে প্রকাশ করা যায় না। সূচকীয় ধ্রুবক বা e এর বেলাতেও ঠিক একই কাণ্ড। e এর মান মোটামুটি ২.৭১৮২৮১৮২৮৪৫৯০৪।

তাহলে দেখা গেল কোনো কিছুর দ্রুত বৃদ্ধি তা সে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি যাই হোক না কেন সেটা বোঝাতে exponential growth এই শব্দ-বন্ধের প্রয়োগ কিন্তু মোটেও সঠিক হচ্ছে না। অথচ সময়ের নিরিখে কী নিখুঁত পরিমাপের যুগে আমাদের বেঁচে থাকা। আর সেখানেই কিনা গণিতের একটি পরিভাষা সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা নিয়ে এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে!

email:acnbul3@gmail.com • M. 8967965340

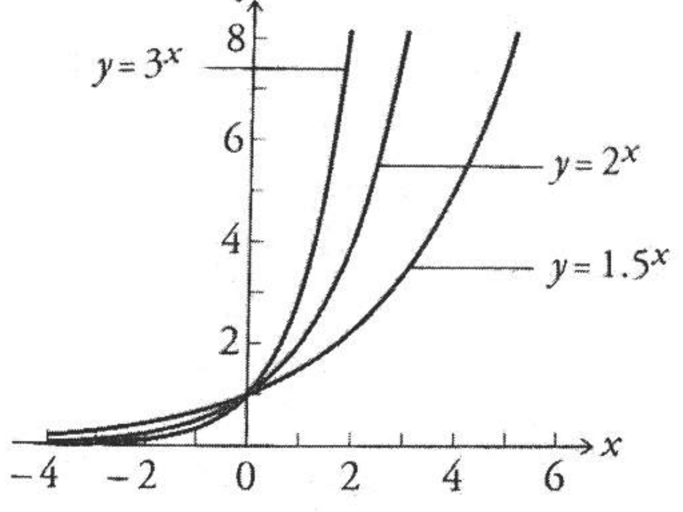

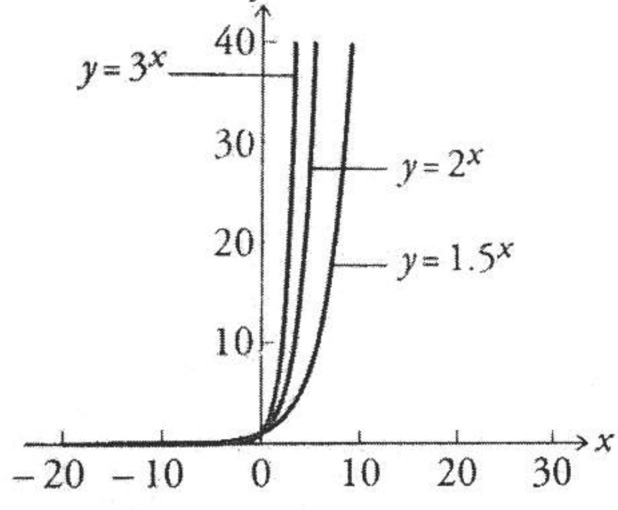

কবিতা

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

গাছ বেড়ে ওঠে

মাঝে মাঝে স্বপ্নের পাখিগুলি
ঘরে এসে বসে—
হাত রাখে কপাল মাথায়,
গান গায় সূর্যের

মাঝে মাঝে ভিখারির হাতে
ব্যথার বাঁশিরা বাজে
কোকিলের সুরে—

নৌকাও আটকায়,
এ প্রান্তে ও প্রান্তে রাখে জল,

সুর আর প্রাণের মাঝখানে
বেড়ে ওঠে গাছ।

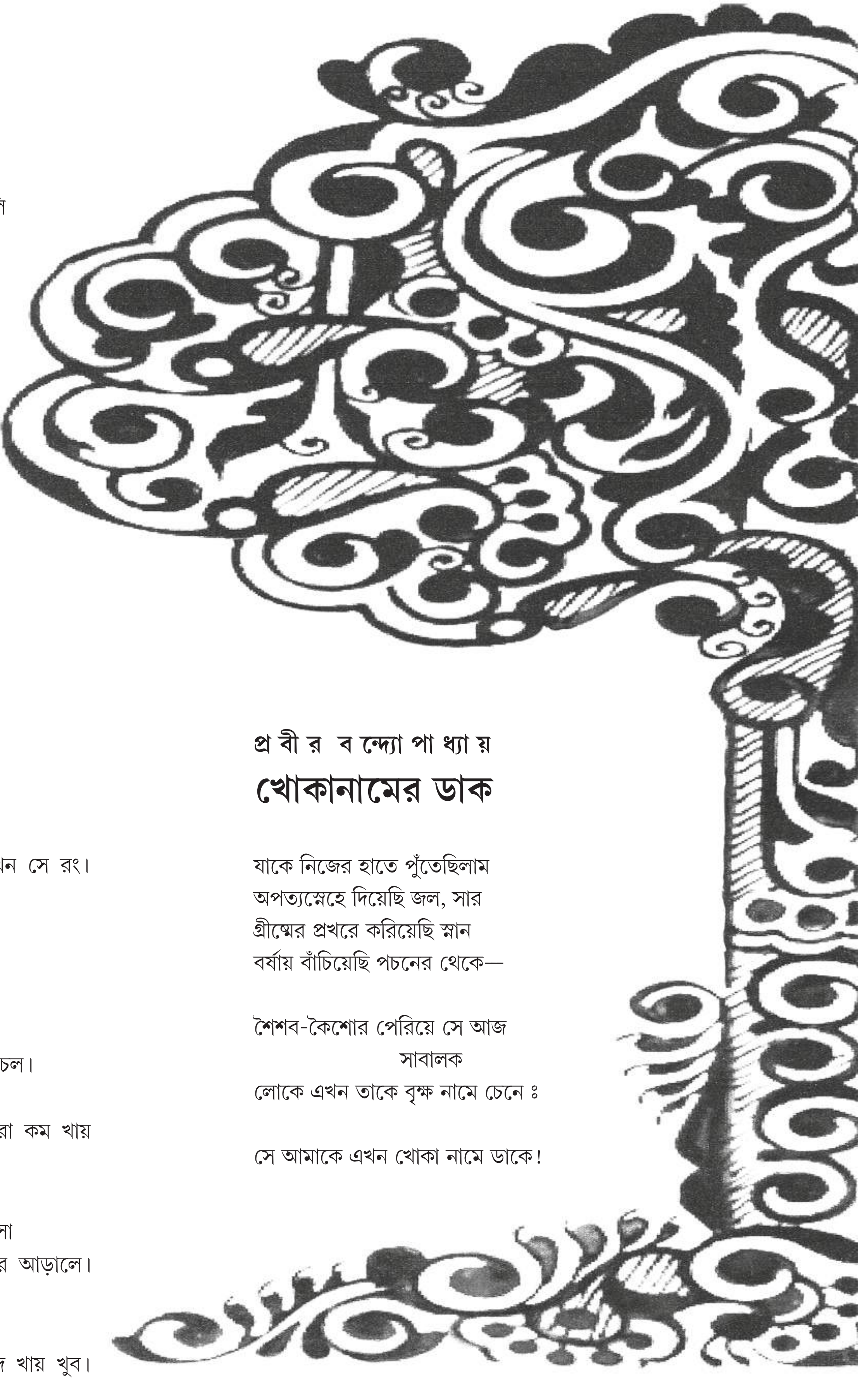

জগন্ময় মজুমদার

রোদ্রভূক

সবুজ মাত্র রোদ খায় না যখন সে রং।

সবুজের প্রাণ আছে
এ, বি আছে ক্লোরফিলের।

রোদের রসিকতা কম না
বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যে তার চলাচল।

আকাশ মেঘলা যেদিন গাছেরা কম খায়
সঞ্চয়ে পড়ে হাত।

জলে ডুবলে আরো কোন্ঠাসা
লুকোচুরি খেলে রোদ মেঘের আড়ালে।

কে কি পারে না
শিশির আচারগুলি কিন্তু রোদ খায় খুব।

প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকানামের ডাক

যাকে নিজের হাতে পুঁতেছিলাম
অপত্যস্নেহে দিয়েছি জল, সার
গ্রীষ্মের প্রখরে করিয়েছি স্নান
বর্ষায় বাঁচিয়েছি পচনের থেকে—

শৈশব-কৈশোর পেরিয়ে সে আজ
সাবালক
লোকে এখন তাকে বৃক্ষ নামে চেনে ঃ

সে আমাকে এখন খোকা নামে ডাকে!

বিপ্রতীপ দে

দান

সূর্য তোমায় দিচ্ছে আলো
গাছ দিচ্ছে হাওয়া,
এমনি করেই এই পৃথিবীর
অনেক কিছু পাওয়া।

ফুল দিচ্ছে বর্ণ গন্ধ
মেঘ দিচ্ছে জল,
নদী দিচ্ছে জলের আয়না
অপূর্ব টলটল।

মা দিচ্ছেন বাবা দিচ্ছেন
দিদা দিচ্ছেন গান
এমনি করেই গড়ে উঠছে
ভালোবাসার টান।

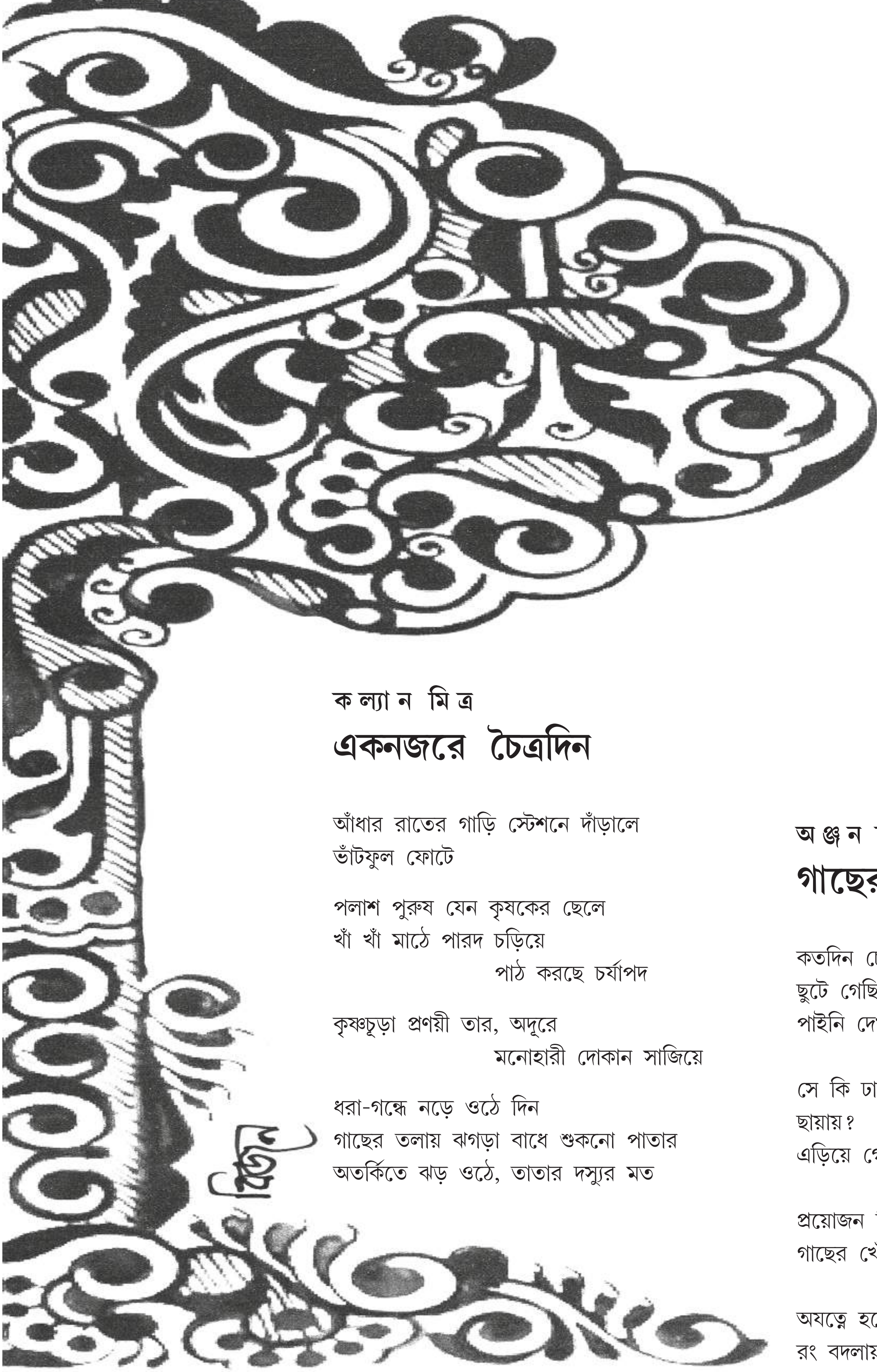

কল্যান মিত্র

একনজরে চৈত্রদিন

আঁধার রাতের গাড়ি স্টেশনে দাঁড়ালে
ভাঁটফুল ফোটে

পলাশ পুরুষ যেন কৃষকের ছেলে
খাঁ খাঁ মাঠে পারদ চড়িয়ে
পাঠ করছে চর্যাপদ

কৃষ্ণচূড়া প্রণয়ী তার, অদূরে
মনোহারী দোকান সাজিয়ে

ধরা-গন্ধে নড়ে ওঠে দিন
গাছের তলায় ঝগড়া বাধে শুকনো পাতার
অতর্কিতে ঝড় ওঠে, তাতার দস্যুর মত

অঙ্কন : বিজন কুণ্ডু

অঞ্জন চক্রবর্তী

গাছের খোঁজে এসে

কতদিন চোখে পড়েনি,
ছুটে গেছি, কেবলই ছুট
পাইনি দেখা কোন ঋজু গাছের ছায়া।

সে কি ঢাকে যন্ত্রণা অন্য কোন
ছায়ায়?
এড়িয়ে গেছি শুধু এড়িয়ে গেছি—

প্রয়োজন ছিল বুঝি, তাগিদ ছিল না
গাছের খোঁজে এসে পেয়েছি আগাছা!

অযত্নে হলেও সে ঘন ও সবুজ
রং বদলায়
ফুল ফল আসে নিয়ম মতন।

দি গ ন্ত পা ল

বুদ্ধিমত্তা

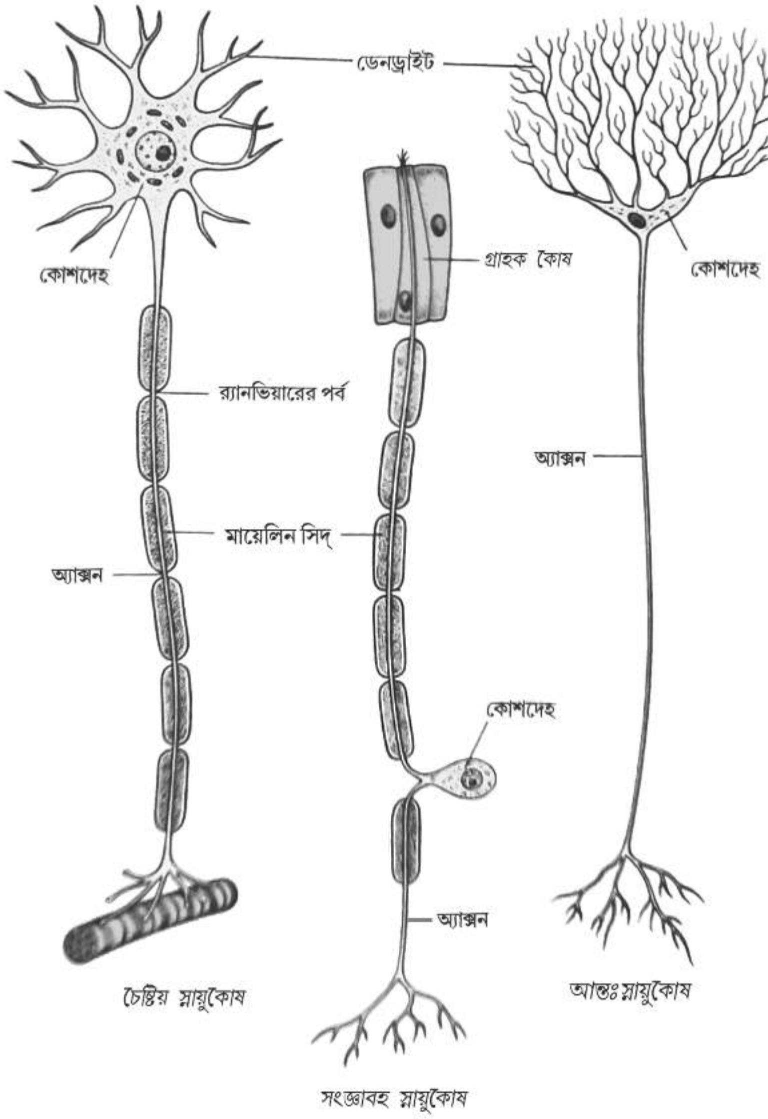

বাংলা ভাষায় "মাথা মোটা" কথাটা বুদ্ধিহীন অর্থে ব্যবহৃত হলেও আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাটিকে প্রশংসা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি কারণ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকলাপ ও বুদ্ধিমত্তার জন্য সত্যই মস্তিষ্কের লিপিড সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, চিন্তাভাবনার বিশেষত্ব বা বয়সের ভিত্তিতে মস্তিষ্কের গঠন ক্রমাগত বদলালেও মস্তিষ্ক মোটামুটি ১০০ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ ও বেশ কিছু স্নায়ুকোষের সাহায্যকারী কোষ বা" গ্লিয়াল কোষ" নিয়ে তৈরি হয়। এই স্নায়ুকোষের সাধারণত তিনটি অংশ থাকে—গোলাকার অংশটি যেখানে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে "কোষ দেহ" বা "সোমা" বলে। সরু ও লম্বা সুতোর মত অংশটি "অ্যাক্সন" নামে পরিচিত এবং স্নায়ুকোষের প্রবর্ধিত ছোট ছোট ও অসংখ্য শাখায় বিভক্ত অংশগুলিকে আমরা "ড্রেনড্রাইট" নামে জানি। এক সংখ্যক স্নায়ুকোষের প্রতিটির কোষ দেহ যে পর্দা (প্লাজমা মেমব্রেন) দ্বারা ঢাকা থাকে, সেটি তৈরি হয় লিপিড-র দুটি স্তর নিয়ে। শুধু তাই নয়। হোয়াইট ম্যাটার বা যে স্নায়ুকোষগুলি দৈর্ঘ্যে বড় এবং যাদের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের বেশ দূর দূর অংশে তথ্য পৌঁছে যায় তাদের অ্যাক্সন যে মায়োলিন আবরণে ঢাকা থাকে তারও ৮০%-ই লিপিড। এ থেকেই বোঝা যায় যে আমাদের সকলেরই মাথা কত মোটা।

আমরা কি করতে পারি তা নির্ভর করে আমরা নিজেদের সম্পর্ক জানতে কতটা আগ্রহী তার উপর। নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের মস্তিষ্ক দ্বারাই পরিাচিলত হই। তাই বলা যায় যে মস্তিষ্ক কি করতে পারে তা নির্ভর করে মস্তিষ্ক তার নিজের সম্পর্কে জানতে কতটা আগ্রহী তার উপর। একটি মস্তিষ্ক তার নিজের সম্পর্কে জানতে কতটা আগ্রহী তার পরিমাপ হল "স্মৃতি" (মেমোরি) ও "চিন্তা" (থট্)। আপনি শুধু নিজের সম্পর্কে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই আপনি অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্যও মনে রাখেন বা অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কেও চিন্তা করেন কিন্তু ভুললে চলবে না যে, আপনার মস্তিষ্ক নিজেকে আরো ভালভাবে জানতে আগ্রহী বলেই সেই তথ্যগুলি তার স্মৃতিতে ধরে রাখে ও নিজেকে জানতে প্রয়োজন মত স্মরণ করে বা নতুন কিছু চিন্তা করে। ভাবলে হয়ত অবাক হবেন যে, একটি তথ্য জানার সময় আপনার মস্তিষ্কের ঠিক যে স্নায়ুকোষগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে সেই একই তথ্য স্মরণ করার সময় সেই একই স্নায়ুকোষসমূহ সক্রিয় হয় না। শুধু তাই নয়, ঐ একই তথ্য বা বিষয় বা ঘটনা আপনি যতবারই স্মরণ করুন না কেন, দেখা যাবে যে প্রতিবার সক্রিয় হয়ে ওঠা স্নায়ুকোষের দলে হয় নতুন কোন স্নায়ুকোষ নাম লিখিয়েছে বা পুরনো কোন স্নায়ুকোষ অনুপস্থিত। আসলে প্রতিবার কিছু স্মরণ করার পর আপনার মন বিবর্তিত হয়, তাই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে মস্তিষ্ক যতবারই নিজেকে জানে, নিজেকে একদম নতুন করে খুঁজে পায়। আরেকটা বিষয় জানলে বোধহয় আপনি আরও অবাক হবেন। পরীক্ষাগতভাবে প্রমাণিত যে, মস্তিষ্কের কাছে জানা তথ্য স্মরণ করা আর নতুন কিছু চিন্তা করার মধ্যে পার্থক্য খুব কম—তাই মস্তিষ্কের কাছে যে কোন আবিষ্কার কোন না কোন জানা সত্যকে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে "স্মৃতি" ও "চিন্তা"—এই দুই স্তম্ভের উপরই গড়ে ওঠে "বুদ্ধিমত্তা"-র ইমারত আর মস্তিষ্ক কি করতে পারে তার পরিমাপ হল এই "বুদ্ধিমত্তা"।

মানুষের বুদ্ধিমত্তা মূলত দুই রকম—"যৌক্তিকতা" (র‍্যাশনালিটি) এবং "কল্পনা" (ইম্যাজিনেশন) বা "স্বজ্ঞা" (ইন্টিউশন) [স্বজ্ঞা হল কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে বা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে করার কল্পনা]। স্নায়ুবিজ্ঞানের আলোকে যৌক্তিকতা কি তা নিশ্চিত করে বলা কিংবা

কল্পনা বা স্বজ্ঞার নির্দিষ্ট একটা ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হলেও সম্ভাব্য কোন ব্যাখ্যা খাড়া করার চেষ্টা করা যেতেই পারে।

আমাদের মস্তিষ্কের সেরিব্রাল কর্টেক্স কতগুলি লোবে (খন্ড) বিভক্ত—ফ্রন্টাল লোব, প্যারাইটাল লোব, অক্সিপিটাল লোব ও টেম্পোরাল লোব।

অক্সিপিটাল লোব-এ অবস্থিত ভিসুয়াল কর্টেক্স-এর কাছাকাছি রয়েছে একটি নিউরাল লুপ (নিউরাল লুপ হল কতগুলি স্নায়ুকোষের সমষ্টি যারা কোন একটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য একটি সিরিজ যা ক্রমে সংযুক্ত থেকে তথ্যকে মস্তিষ্কের এক স্থান থেকে স্থানান্তরে বয়ে নিয়ে যায়) যা দৃষ্টি সম্বন্ধীয় তথ্যের (ভিসুয়াল ডেটা) শর্ট টার্ম মেমোরি (স্বল্প মেয়াদি স্মৃতি) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও একটি ফোনোলজিকাল নিউরাল লুপ আছে যা ফ্রন্টাল লোব-এ অবস্থিত "ব্রকাস্ এরিয়া"-র সাথে সম্মিলিতভাবে শব্দ ও ভাষা সম্বন্ধীয় তথ্যের (অডিও ডেটা) শর্ট টার্ম মেমোরি হিসাবে কাজ করে। এই প্রসঙ্গে "শর্ট টার্ম মেমোরি" কি তা সহজ করে বলে দিই। আপনি এখন যে বাক্যটা পড়ছেন তার অর্থ বুঝতে গেলে বাক্যের শেষের দিকের অংশটা পড়ার সময় বাক্যের শুরুটাও আপনাকে মনে রাখতে হবে আর আপনার মস্তিষ্কের শর্ট টার্ম মেমোরি-ই এই কাজটা করে দেয় অর্থাৎ অল্প সময়ের (১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড অথবা কখনও ১ মিনিট) জন্য অল্প কিছু তথ্য সে ধরে রাখে।

সেরিব্রাল কর্টেক্স এর ফ্রন্টাল লোব এর সামনের দিকে অবস্থিত "প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স"-এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী অংশটি (সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ পার্ট), প্রয়োজন মত পূর্বোক্ত দুই প্রকার শর্ট টার্ম মেমোরিতে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সার্চ ক্রাইটেরিয়া হিসাবে ব্যবহার করে ডিক্ল্যারেটিভ লং

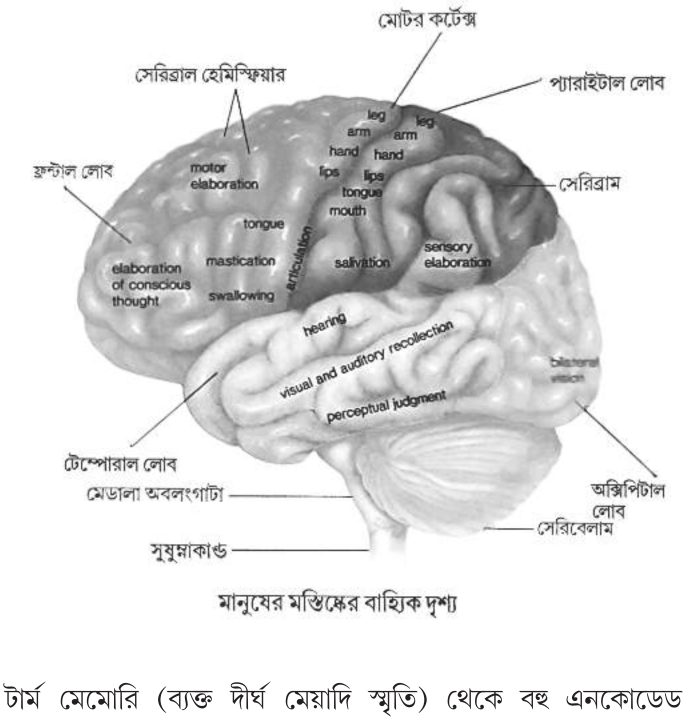

মানুষের মস্তিষ্কের বাহ্যিক দৃশ্য

টার্ম মেমোরি (ব্যক্ত দীর্ঘ মেয়াদি স্মৃতি) থেকে বহু এনকোডেড (সংকেতাক্ষরে লিখিত) তথ্য উদ্ধার (রিট্রিভ) করে তাকে ডিকোড (পাঠোদ্ধার করা) করে—একেই মস্তিষ্কের "কার্য-কারণ (ক্যাসালিটি) ভিত্তিতে স্মরণ করা" বলা হয়ে থাকে। আর এনকোডেড তথ্যগুলিকে উদ্ধার করে ডিকোড করার পর তাদেরকে কাজে লাগানোর জন্য যদি পুনরায় এনক্রিপ্ট করা হয়, তারই নাম "কার্য-কারণ ভিত্তিতে নতুন কিছু ভাবা বা চিন্তা করা" [অর্থাৎ একটি মস্তিষ্কের যে কোন নতুন ভাবনা হল আদতে ঐ মস্তিষ্কেরই কোন না কোন স্মৃতির এনক্রিপ্টেড রূপ]। এই দুই নিয়েই "যৌক্তিকতা"। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মস্তিষ্ক একই তথ্যকে যতবারই এনকোড বা ডিকোড বা এনক্রিপ্ট করুক না কেন, প্রত্যেকটি ডিকোডেড রূপ (ফর্ম) বা এনক্রিপ্টেড রূপ যেমন অনন্য হয়, প্রত্যেকটি এনকোডেড রূপও তেমনই অনন্য। তাই মস্তিষ্ক চিন্তা বা স্মরণ করার পর তথ্যসমূহকে সঞ্চিত রাখার জন্য পুনরায় তাকে এনকোড করে নিলে, সেই নতুন করে এনকোড করার তথ্যে ধারক হিসাবে মস্তিষ্কেরও বিবর্তন অবশ্যম্ভাবি হয়ে পড়ে।

এখন "এনকোডিং" ও "এনক্রিপশন"-এর প্রধান পার্থক্য কি তা বোঝা আবশ্যক। তথ্যকে এনকোড করার হয় যাতে প্রায় সকল ভোক্তা (কন্সিউমার) তাকে ডিকোড করে তার পাঠোদ্ধার করতে পারে কিন্তু এনক্রিপ্ট করা হয় যাতে নির্দিষ্ট কিছু ভোক্তাই সেই তথ্য বোঝে। নির্দিষ্ট ভোক্তা ছাড়াও বাকি ভোক্তারা এনক্রিপ্টেড তথ্য বুঝে নিতেই পারে কিন্তু তা অনেক ক্ষেত্রেই সময় সাপেক্ষ। "স্পেশাল থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি" তত্ত্বের ইতিহাস ঘাটলে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইন্সটাইন-এর মস্তিষ্কের যে চিন্তাভাবনা থেকে এই তত্ত্বের জন্ম হয়, তার এনক্রিপশন এতটাই শক্তিশালী ছিল যে তৎকালীন অধিকাংশ জ্ঞানী-গুণী বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক তার মর্ম বোঝেনি—ব্যতিক্রম ছিলেন বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক। প্রায় সমগ্র বিজ্ঞানী মহলেই এই তত্ত্ব স্বকৃতি পায় ঠিকই। কিন্তু তা সম্ভব হতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগে যায়।

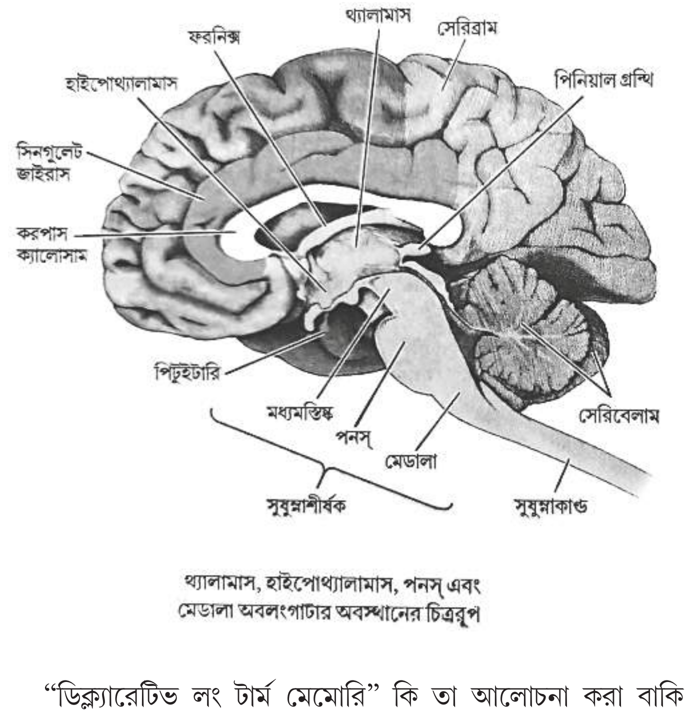

থ্যালামাস, হাইপোথ্যালামাস, পনস্ এবং মেডালা অবলংগাটার অবস্থানের চিত্ররূপ

"ডিক্ল্যারেটিভ লং টার্ম মেমোরি" কি তা আলোচনা করা বাকি রয়ে গেছে। আপনি তিন-চার বছর বা তারও আগে যে সিনেমাটি দেখেছেন তার বিষয়বস্তু, আমরা কোথাও বেড়াতে গিয়ে আপনি কি

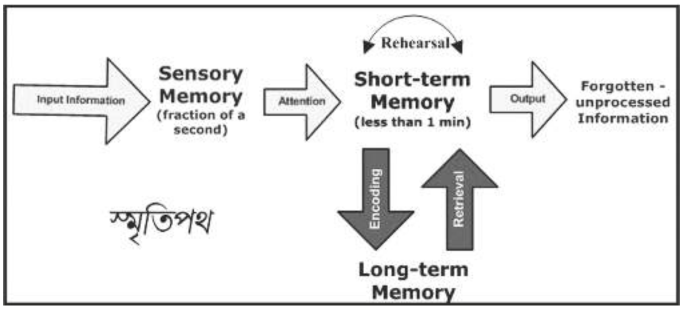

স্মৃতিপথ

কি করেছেন বা কি কি দেখেছেন তা স্মরণ করে গরগর করে বলে দিতে পারেন এই ডিক্ল্যারেটিভ লং টার্ম মেমোরি-র বদান্যতায়। মস্তিষ্ক, যে তথ্যগুলো এই ব্যক্ত দীর্ঘ মেয়াদি স্মৃতি হিসাবে সঞ্চিত রাখবে বলে ঠিক করে, টেম্পোরাল লোব-র মধ্যভাগে অবস্থিত হিপ্পোক্যাম্পাস এন্টোরাসনাল কর্টেক্স ও পেরিরাইনাল কর্টেক্স অংশ তিনটি তথ্যগুলিকে এনকোড সংকেতাক্ষরে লেখে কিন্তু তথ্যগুলির কন্সলিডেশন (একত্রীকরণ) ও তারপর তারা সঞ্চিত হয় (স্টোরিং) সাধারণত টেম্পোরাল কর্টেক্সে।

কল্পনা বা স্বজ্ঞা

কিছু বিষয় আছে যা স্মরণ করতে হয় না বা স্মরণে রাখতে হয় না, স্মরণে রয়ে যায়। আমি সাইকেল চালানো শিখে তিন বছর অল্পবিস্তর সাইকেল চালিয়েছিলাম। গত এগারো বছর আমি সাইকেল ছুঁইনি পর্যন্ত কিন্তু আমি আত্মবিশ্বাসী যে সাইকেল চালতে গিয়ে আমি মোটেই ভারসাম্য হারাব না কারণ সাইকেল চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ কিংবা বাদ্যযন্ত্র বাজানোর দক্ষতা মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবেই তার প্রসিডিউরাল লং টার্ম মেমোরি (পদ্ধতিগত দীর্ঘ মেয়াদি স্মৃতি)-তে জমা করে রাখে। তবে এমন অনেক তথ্য আছে যারা ডিক্ল্যারেটিভ লং টার্ম মেমোরি-র জন্য উপযুক্ত হলেও সেই তথ্যের দৈনন্দিন জীবনে খুব বেশি ব্যবহারের জন্য মস্তিষ্ককে প্রায়ই তথ্যগুলিকে চটজলদি স্মরণ করতে হয় কিংবা কিছু বিষয়ে আমাদের পছন্দ বা বিশেষ অনুভূতির কারণে মস্তিষ্ক সেই সংক্রান্ত তথ্যগুলি নিজ স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করতে চায়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রোসিডিউরাল লং টার্ম মেমোরি-ই ভরসা। সেরিবেলাম, পুটামেন, কডেট নিউক্লিয়াস ও মোটর কর্টেক্স মস্তিষ্কের এই চারটি অংশ নিয়ে প্রোসিডিউরাল লং টার্ম মেমোরি তৈরি হয় যেখানে তথ্যগুলির এনকোডিং ও স্টোরিং উভয়ই সম্পাদিত হয়।

“যৌক্তিকতা” আলোচনা করার সময় মস্তিষ্কের স্মরণ করা বা চিন্তা করার যে প্রয়োগটা ইতিমধ্যে বলেছি সেই প্রক্রিয়ায় যদি ডিক্ল্যারেটিভ লং টার্ম মেমোরি-র জায়গায় এই প্রোসিডিউরাল লং টার্ম মেমোরিকে বিবেচনা করি তাহলে মস্তিষ্কের চিন্তা বা স্মরণ করাটা নিতান্তই

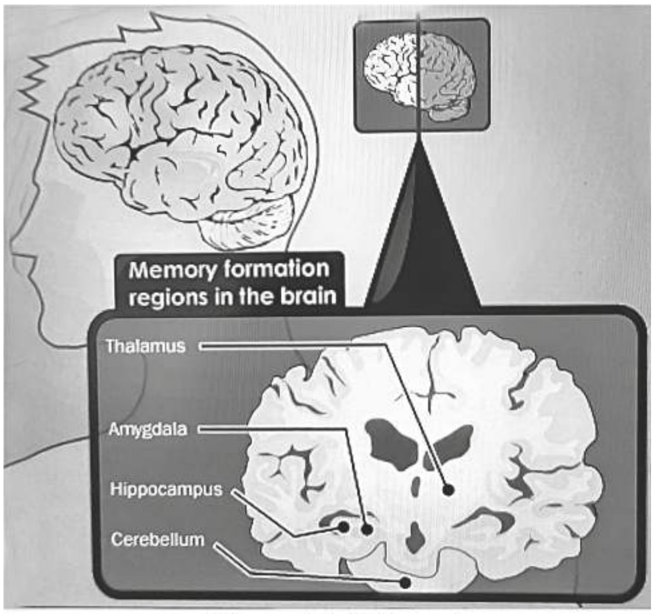

মস্তিস্কর স্মৃতি তৈরির অঞ্চল

যুক্তি-নিরপেক্ষ হয়—এটিই মস্তিষ্কের কল্পনা বা স্বজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। স্বজ্ঞা ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য এইটুকুই যে কল্পনা হল এনক্রিপ্টেড তথ্যসমূহের সমষ্টি কিন্তু স্বজ্ঞা মধ্যস্থিত তথ্যগুলি ডিকোডেড রূপে থাকে।

email:digantapaul5@gmail.com • M. 9874556152

সংবাদ

বাজি নিয়ে পড়ুয়াদের ভাবনা

স্কুল-পড়ুয়াদের মধ্যে উৎসবের মরশুমে করোনা সচেতনতা বাড়াতে (৮ নভেম্বর) একটি আলোচনা সভায় ‘বাজি পোড়াও, করোনা ছড়াও—সমস্যা বাড়াও?’ শীর্ষক এক অভিনব বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করল পিপলস, অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (পেস্)। সম্পাদক ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদার শুরুতেই বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেন। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সৈকত মৈত্র বলেন, আত্মপোলব্ধি ছাড়া সচেতনতা সম্পূর্ণ হয় না। তাই ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে উৎসবের মরশুমে করোনা সচেতনতা বিষয়ে ভাষণ প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। ডা. শিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বাজির জন্য করোনা রোগীদের যে ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেন। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা পেস্-এর সভাপতি অধ্যাপক বিনয়কান্তি দত্ত বাজি-নিঃসৃত বিষাক্ত রাসায়নিকের উপাদান ও আমাদের স্বাস্থ্যের উপর তার কুফল অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্যনিষ্ঠ আকারে তুলে ধরেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের এই বছর ‘বাজি-রোগ’ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন। রাজ্য জৈব-বৈচিত্র্য পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. অশোক কান্তি সান্যাল পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে জৈববৈচিত্র্য রক্ষার প্রেক্ষিতে এক অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য পেশ করেন। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের ৫টি জেলার ১২টি স্কুলের ২৩ জন পড়ুয়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

অমিতাভ চক্রবর্তী

গলিত লোহার বৃষ্টি হয় যে গ্রহটিতে

"বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে"

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত এই কবিতার লাইনদুটি এই গ্রহটির জন্য কতটা সত্যি? জেনিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেভিড এরেনরিখ মজা করে বলেন, "কেউ বলতেই পারে এখানে বিকেল থেকে বৃষ্টি শুরু হল, তবে এ বৃষ্টি গলিত লোহার বৃষ্টি"। সম্প্রতি ওদের গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে বিজ্ঞানের ঐতিহ্যবাহী জার্নাল নেচার-এ। পৃথিবী থেকে প্রায় ৬৪০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই গ্রহটিকে বিজ্ঞানীরা WASP-76b নামে চিহ্নিত করেছেন। অদ্ভুত চরিত্রের এই গ্রহটির একটি দিক সবসময় কেন্দ্রীয় নক্ষত্রের (যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে গ্রহটি) দিকে মুখ করে থাকে বলেই সেখানকার তাপমাত্রা এত বেশি। চিরস্থায়ী অন্ধকারে ঢাকা চাঁদের মতন। বার্ষিক গতির সাপেক্ষে অত্যন্ত ধীর আহ্নিক গতির এই অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'সিঙ্ক্রোনাস রোটেশন'। যেমন চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসে দিন সময়ে, আবার নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতেও চাঁদের সময় লাগে প্রায় ২৭ দিন। তাই পৃথিবী থেকে এই উপগ্রহটির কেবল একটি দিকই আমরা সবসময় দেখতে পাই। WASP-76b গ্রহটিতে তাই দিন-রাতের পরিবেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। সকালের পরিবেশে এইরকম লোহার বাস্পের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি তারা। অথচ দিনের উত্তপ্ত আবহে রয়েছে লৌহ-বাস্পের বিপুল আয়োজন। দিন ও রাতের মধ্যেকার যে অংশে বিকেল বা সন্ধ্যা সেখানে লৌহ-বাস্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির আকারে ঝড়ে পড়ছে। এমনকি এই বাস্পের খানিকটা অংশ রাতের দিকে সরে গিয়ে বৃষ্টি ঘটাচ্ছে সেখানেও। এই আজব গ্রহের সুলুকসন্ধান সম্পর্কে আপাততঃ গবেষকদের উৎসাহ তুঙ্গে।

ডার্ক ম্যাটার নিয়ে নতুন তথ্য?

মহাবিশ্বের প্রায় ৮০ শতাংশ দখল করে আছে কৃষ্ণ পদার্থ বা ডার্ক ম্যাটার। এ তথ্য জানা ছিল অনেকদিন ধরেই। কিন্তু দশকের পর দশক ধরে অনেক গবেষণা সত্ত্বেও এই নিয়ে বিজ্ঞানীদের জানাবোঝা খুব একটা এগোয় নি। বিশেষ করে ঠিক কি দিয়ে তৈরি এই কৃষ্ণ পদার্থ, এই প্রাথমিক প্রশ্নেরই কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে আমাদের চেনা নক্ষত্রমণ্ডল বা গ্যালাক্সিদের সঙ্গে এদের মহাকর্ষীয় বলের অস্তিত্ব বুঝতে পারছিলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু এই কৃষ্ণ পদার্থ এমন কিছু দিয়ে গড়া, যাতে করে এরা আলো অর্থাৎ কোনো তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ শোষণ, প্রতিফলন বা বিকিরণ কিছুই করে না। তাই এদের সম্পর্কে কোনো তথ্যই দীর্ঘদিন পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক খুঁজে পেয়েছেন এক বিশেষ ধরনের মৌলিক কণা, যার নাম 'ডি-স্টার হেক্সাকোয়ার্ক'। অর্থাৎ ছ'টি কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি এই কণা। এই কোয়ার্ক হল বিশেষ প্রকারের প্রাথমিক কণা যা বিভিন্ন পদার্থের মৌলিক একক। কোয়ার্ক নিজেরা পরস্পরে মিলে গঠিত হয় হেড্রন জাতীয় কণা। কণা পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী তিনটি করে কোয়ার্ক মিলে তৈরি হয় প্রোটন ও নিউট্রনের মতো হেড্রন কণা, যারা পরমাণুর নিউক্লিয়াস গঠন করে। তবে ছ'টি কোয়ার্ক দিয়ে গঠিত এই ডি-স্টার হেক্সাকোয়ার্ক আদতে বোসোন জাতীয় কণা। যার অর্থ এরা একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে যে পদার্থ তৈরি করবে সেটা আমাদের পরিচিত প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে তৈরি জগতের মতো নয়। গবেষকদের মতে মহাবিশ্বের জন্মলগ্নে অর্থাৎ বিগব্যাং এর অনতিবিলম্বে যখন মহাবিশ্ব দ্রুত প্রসারিত ও শীতল হচ্ছিল, তখন বিপুল পরিমাণ ডি-স্টার হেক্সাকোয়ার্ক নিজের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে প্রথমে বোস-আইনস্টাইন কনডেন্সেট-এর মতো পদার্থের পঞ্চম দশার সৃষ্টি করে। তারপর সময়ের নিরিখে যা ডার্ক ম্যাটার হিসাবে আড়ালে চলে যায়। এই ডি- স্টার হেক্সাকোয়ার্ক-কেই ডার্ক ম্যাটারের সম্ভাব্য গঠনকর্তা বলে মনে করছেন গবেষকরা। "A new possibility for light-quark dark matter" শিরোনামে লেখা গবেষণাপত্রটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে Journal of Physics G Letters এ। সত্যিই কি ডার্ক ম্যাটারকে জানাবোঝার ক্ষেত্রে কিছুটা এগিয়ে গেলো বিজ্ঞান?

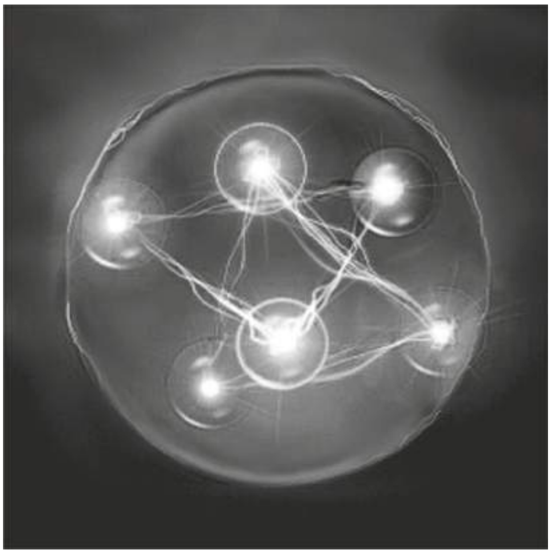

কৌ শি ক রা য়

আমরাই যখন ফাস্ট ফুড

অনুবীক্ষন যন্ত্রে বেডবাগ (লাইমেক্স লকটুলারিস)

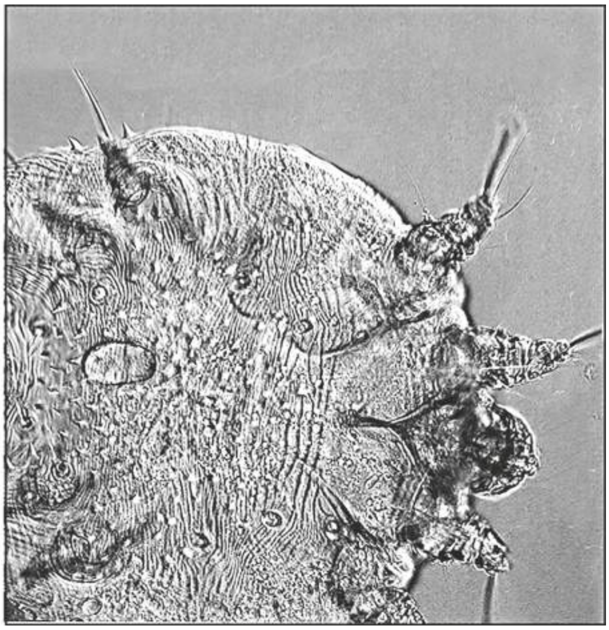

দেখা যাচ্ছে আমাদের ত্বকের প্রতি বর্গগজ সীমারেখার মধ্যে যত জীবাণু আছে ভারত বা মার্কিন দেশের একটি রাজ্যের গড়পড়তা জনসংখ্যা ততটা। আমরা যতই ভাবি নামি দামী বিজ্ঞাপিত কোম্পানির আর চিত্রতারকাদের দ্বারা স্পনসর্ড হওয়া সুগন্ধি সাবান, বিউটি-বার, শ্যাম্পু, হেয়ার কন্ডিশনার আর ফেস-ওয়াশ দিয়ে আমরা নিজেদেরকে সাফ-সুতরো করছি, অসংখ্য অদৃশ্য রক্তপিপাসু এবং পরজীবী জীবাণু কিন্তু আমাদের শরীরে থেকেই যায়। এই পরজীবীগুলি দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চির ভাগ। ত্বকের কোষগুলি খাওয়ার জন্য এদের শরীরে আছে নখ এবং সূচের মত তীক্ষ্ণ মুখবিবর। মাছের আঁশ এবং তীরের ফলার মত দেখতে হয়, আমাদের ত্বকের ওপর অদৃশ্যভাবে আটকে থাকা পরজীবীদের ডিমগুলি। এহেন পরজীবী উকুনকে নিজের চুলে দেখেই সপ্তদশ শতকে ফরাসি নৃপতি একাদশ লুই মন্তব্য করেন এই পরজীবীরাই মনে করিয়ে দিচ্ছে—রাজারাও হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখলে আমাদের ত্বকেও আক্রমণ হতে পারে রক্তখেকো উকুন বা "ব্লাড লাইস"-এর ("পেডিকিউল্যুস হিউম্যানাস")।

কিশোর কবি সংগ্রামী কন্ঠের সুকান্ত ভট্টাচার্য বিরচিত "ভালো খাবার" শীর্ষক কবিতাতে "জমিদার মস্ত" —ধনপতি পাল নিষ্ঠুরভাবে হেসে বলেছিল —"সব থেকে ভালো খেতে গরিবের রক্ত"। শুধু গরিবেরই নয়—আমাদের মত সমস্ত মানুষেরই রক্তকে অনায়াসে ফাস্ট ফুড বানিয়ে ভুরিভোজ করে যাচ্ছে আমাদেরই দেহের মধ্যে বসত করে থাকা অসংখ্য প্রাণী। তাদের জীবনধারণের পথে আমাদের শরীর যেন এক একটা বাস্তুতন্ত্র অথবা ইকোসিস্টেম।

মানবদেহের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা অগণিত "বেডবাগ" বা "মাইট"-এর মত প্রাণীদের জীবনপ্রণালী নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে আসছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্লিফ ডেশ। তিনি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানিয়েছেন—আমাদের মুখের চামড়ার খাঁজে লুকিয়ে আছে অন্ততঃ দুটি প্রজাতির পরজীবী কীট (Mites)। এদের মধ্যে একটি মাথার চুলের গোড়ার মধ্যে বা হেয়ার ফলিকল-এ বসবাস করে। মুখের ঘর্মগ্রন্থি বা "সেবাসিয়াস গ্ল্যান্ড" (Sebaceous gland)-এর মধ্যে বসবাস করে আরো এক ধরনের কীট।

সরীসৃপদের সম্পর্কে আমাদেরকে খোঁজখবর দিয়েছেন প্রবাদপ্রতিম প্রাণীবিজ্ঞানী স্যার রিচার্ড আওয়েন। ১৮৪০ সালে স্যার রিচার্ড এই পরজীবী প্রাণীটির নাম রাখেন—"ডেমোডেক্স" (Demodex)। নামে 'পোকা' হলেও এই পরজীবীটি আসলে অ্যারাক্নিড (Arachnid) বা মাকড়শাদেরই গোত্রভুক্ত। আমাদের চোখের পাতা ও ভ্রূ-জোড়ার মধ্যেও থাকে আর এক ধরনের পরজীবী—"ডেমোডেক্স ফলিক্যুলড্রাম" (*Demodex folliculdrum*)। চোখের পাতার চামড়ার জীবন্ত কোষ এদের খাদ্য।

এই ধরনের দেহ পরজীবী বা "প্যারাসাইট"-দের নিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক উপকথা, কিংবদন্তী লোককাব্য। ইংল্যান্ডের "মেটাফিজিক্যাল" ঘরানার রোম্যান্টিক কবি জন ডান দেহের উকুন জাতীয় পরজীবীদেরকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। যুগে যুগে প্লেগ, টাইফাস, পীতজ্বর আর ম্যালেরিয়ার মত মারণ মহামারীকে মানবসমাজের দিকে অভিশাপের মত ছুঁড়ে দিয়েছে এই ধরনের পরজীবীরা। অবশ্য প্রতিদিন আমাদের ত্বক থেকে বর্জিত লাখো লাখো মৃত কোষকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আমাদের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকরও রাখে এরকম অনেক পরজীবী কীটাণু। জোঁক-এর মত পরজীবীরা (হিরুডো মেডিসিনালিস) ব্যবহৃত হয়, অঙ্গ সংস্থাপনের পর মানবদেহে আবার নতুন করে রক্ত চলাচল শুরু করাতে। আবার 'অ্যামেরিকান ডগটিক' নামক পরজীবীটির ক্ষমতা আছে প্রায় দুরারোগ্য—'মাউন্টেন স্পটেড ফিভার'-এর ব্যাকটিরিয়াকে আমাদের দেহে ছড়িয়ে দেওয়ার। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া যায় "বটফ্লাই" নামক এক ধরনের মাছি। এরা অন্য মশামাছিকে ধরে, তাদের পেটের নীচে ডিম আটকে দেয়। দিনের বেলাতে মানুষের ঘাম ও শরীরের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এই মশা

যখন মানুষকে কামড়ায় তখনই এই ডিমগুলো আমাদের ত্বকের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে রক্তস্রোতে মিশে যায়, মশাদের বাহিত এই ব্যাকটিরিয়াগুলি।

মানুষের তৈলাক্ত ত্বকের কোষে বাসা বাঁধে, ইস্ট-এর গোত্রভুক্ত এক ধরনের পরজীবী (*Malassezia furfur*)। এই পরজীবীর প্রকোপে আমাদের ত্বকে ঘটে "পাইটাইরিয়াসিস ভারসিকোলোর" নামক এক ধরনের রোগ। এই রোগের ফলে আমাদের ত্বক এবং মাথার তালুর চামড়ার রং ফ্যাকাশে হয়ে যায়। চামড়া হয়ে যায় খসখসে। জুতো-মোজা ঢাকা, আমাদের আর্দ্র পায়ের ত্বকে হাজার মত সংক্রমণ (অ্যাথলেটস্ ফুট) ঘটায় "ক্যানডিডা অ্যালবিক্যানস্ ট্রাইবোফাইটন মেনটাগ্রোফাইটিস" নামক ছত্রাক জাতীয় পরজীবী। গ্রীন হেড ফ্লাই (টাবাসুস নাইগ্রোভাইট্যাটুস) নামক পরজীবীটিও, তার কাঁচি-র মত ধারালো মুখবিবর দিয়ে আমাদের চামড়া ছিঁড়ে নিয়ে রক্ত পান করে। কেরাটিন সমৃদ্ধ মাটিতে পাওয়া যায় এক ধরনের ছত্রাক—"মাইকোসফোরাম জাইপেসাম"। এই ছত্রাকটিই আমাদের শরীরে রিংওয়ার্ম বা দাদ-এর সংক্রমণ ঘটায়।

আমাদের মাথার চুলে নিজের ডিম বা "নিট" থেকে বের হওয়ার সময় নিজের চারদিকে একটা বাতাসের বুদবুদ রচনা করে "হেড লাউস" উকুন। বিভিন্ন অ্যান্টি-লাউস ক্রীম, শ্যাম্পু এবং চিরুনির মাধ্যমেও নির্মূল করা যাচ্ছে না রক্তবীজের বংশধর এই উকুনদেরকে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন নিজেদের শরীরকে ক্রমাগতই বিবর্তিত বা মিউটেশন করছে এই মাথার উকুনরা। আবার এই ধরনের উকুন-মারা শ্যাম্পু ও এয়ার-কন্ডিশনার থেকে শিশুদের হৃদরোগ এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুজনিত রোগও হয়। আমাদের ত্বকের ওপর মলত্যাগ করা বিভিন্ন পরজীবীর থেকে আমাদের ত্বকে চুলকানি আর র‍্যাশের মত অস্বস্তিকর উপসর্গ হয়। তখন কিন্তু চিরস্থায়ী প্রতিষেধক হতে পারে নামী কোম্পানির অ্যান্টিসেপটিক লোশনগুলি।

M. 9547659679

আজব যত নীহারিকা ১

তন্ময় ধর

এস্কিমো নীহারিকা (Eskimo nebula)

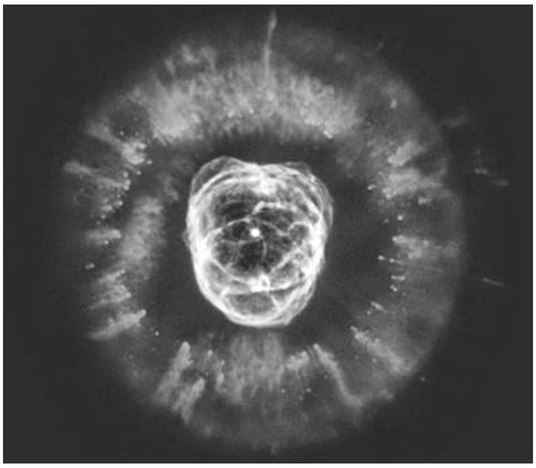

পৃথিবী থেকে প্রায় ২৮৭০ আলোকবর্ষ দূরের এই সুন্দর নীহারিকাটিকে ছোট দূরবীনের সাহায্যে সহজে দেখা যায়। মিথুন রাশির (constellation Gemini) এই নীহারিকার অপর নাম ক্লাউনমুখো নীহারিকা (Clownface nebula)। ১৭৫৭ সালে জ্যোতির্বিদ উইলিয়ম হার্শেল এই দশম প্রভার নীহারিকাটিকে আবিষ্কার করেন। এর কেন্দ্রীয় অংশের তারাটি একটি '০৪' শ্রেণীর বিষম তারা। তারাটির সাংকেতিক নাম রাখা হয়েছে 'এইচ ডি ৫৯০৮৮' (HD 59088)। নীহারিকার বাইরের দিকে যে গ্যাস ছড়িয়ে আছে তা একেবারে সূর্যজাতীয় তারার বহিঃস্তরের মতো। মাত্র ১০০০০ বছর আগে সূর্য জাতীয় একটি তারকা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত গ্যাস থেকে তৈরি হয়।

নীহারিকার আলোকিত অংশের বিস্তৃতি ১/৩ আলোকবর্ষ। নীহারিকার বাইরের দিকের গ্যাসীয় বলয়টির প্রকৃত বিস্তৃতি নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। নাসার সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এই নীহারিকার কেন্দ্রীয় অংশটির তাপমাত্রা প্রায় ৫০০০০ কেলভিন এবং তার ধাক্কায় জ্বলন্ত গ্যাস প্রায় ৬০ লক্ষ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

email:tstorm.tanmay@gmail.com • M. 9892359674

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া 9332280602 • জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/9331035550 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায় , বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার , বনগাঁও M. 8637847365 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর , রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) • গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 • শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129 • সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ M. 9434570130 • বামা পুস্তকালয়, কাকদ্বীপ M. 9434570130 • অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 • অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 • সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 • উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 • সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ • শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, 9609844676/ 7908341942 • ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, 9635995476 • বালিঘাইনারায়ণ চন্দ্ররানা সায়েন্স ক্লাব M. 9800436364 • ষড়ানন পন্ডা এড়াল M. 6294168820

গৌ ত ম ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

জ্যোতিষশাস্ত্রের ভিত্তি

[জানু-ফেব্রু সংখ্যায় যা ছিল ঃ মহাবিশ্বের বিশালতা ঃ...ছায়াপথ, আমাদের ব্রহ্মান্ড আসলে সূর্যের মত কোটি কোটি তারার ধুলো। ঐ ধুলো একেকটা কণা, একেকটা সূর্য অর্থাৎ তের লক্ষ পৃথিবীর সমান। এমন দশ হাজার কোটি তারা বা সূর্য আছে আমাদের ছায়াপথে। ছায়াপথের দুটি প্রান্তের দূরত্ব প্রায় এক লক্ষ আলোকবর্ষ। মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় যা ছিল ঃ ইতিহাস ঃ পাঁচ হাজার বছর আগে বিভিন্ন দেশে গড়ে উঠেছিল জ্যোতিষশাস্ত্র। টেলিস্কোপ আবিষ্কারের মাধ্যমে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হল।]

টলেমি

টলেমির কল্পনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

আমাদের ক্লাস ওয়ান-টু-এর ছোট্ট শিশুরা যখন বইয়ে পড়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, জ্যোতিষশাস্ত্রের সূর্য তখনও পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। বেচারা সূর্য! জ্যোতিষবিদ্যার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড টলেমির সেই ষোড়শ শতাব্দীর আগের পৃথিবী কেন্দ্রিক। মাথার ওপর আকাশ একটি গোলকের মত পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। ঐ গোলকের গায়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সূর্য যে বৃত্তরেখা বরাবর পৃথিবীর চারদিকে আকাশ পরিক্রমা করছে সেটি হল রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্ত। আর এই রবিমার্গের দুপাশে ৮° অর্থাৎ মোট ১৬° চওড়া আকাশ, যেন অনেকটা নাগরদোলার মত পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। এই ১৬° চওড়া বলয়টিই হল ক্রান্তিবলয় বা রাশিচক্র (Zodiac)। কারণ এই বলয়টির মধ্যেই সমস্ত গ্রহের এবং কিছু নক্ষত্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ বা রাশির (Constellation) পরিক্রমা পথ। আশ্চর্যভাবে এই সামান্য ১৬°-র বাইরের বিশাল আকাশের কোনো নক্ষত্র বা রাশিই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিবেচ্য নয়। ৩৬০°-র এই রাশিচক্রকে ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়। এক একটি ৩০° ভাগের আকাশকে এক একটি রাশি ধরা হয়। প্রতি ভাগে একটি করে বিশেষ রাশি বা constellation থাকে। যেমন : মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। বিশেষ প্রাণী বা বস্তুর আকারের সাদৃশ্যে এই নামকরণ। প্রতিটি রাশিতে একটি করে উজ্জ্বল নক্ষত্র রয়েছে, যেমন : সিংহ রাশিতে মঘা, বৃশ্চিকে জ্যেষ্ঠা, কন্যাতে চিত্রা ইত্যাদি। সূর্য এক এক মাসে একেক রাশিতে থাকে। যেমন : বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ, আষাঢ়ে মিথুন ইত্যাদি। সমস্ত গ্রহের পরিক্রমা পথ এই রাশিচক্রের মধ্যেই পড়ে। জ্যোতিষশাস্ত্রের নটি গ্রহ হল—রবি (সূর্য), সোম (চাঁদ), মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু। রাহু, কেতুকে কল্পনা করা হয়েছে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সময় বিশেষ দুটি জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থান করে যারা চন্দ্র ও সূর্যকে গ্রাস করে। তাই গ্রহণ হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই দুটি গ্রহের কোনো হদিস মহাকাশে আজও পাওয়া যায়নি।

চন্দ্র প্রতি ২৭ দিনে (চান্দ্রমাস) রাশিচক্র সম্পূর্ণ একবার আবর্তন করে। সেজন্য চন্দ্র প্রতিদিন একেকটি নক্ষত্রে অবস্থান করে। সেই ২৭টি নক্ষত্রকে বিশেষভাবে 'নক্ষত্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। রাশিচক্রের অন্য তারারা 'নক্ষত্র' নয়। রাশিচক্রের ৩৬০°কে ২৭ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ১৩° আকাশ একেকটি নক্ষত্র ঐ নক্ষত্রের নামে। তাহলে ২ দিন করে চাঁদ প্রত্যেক রাশিতে থাকে। চাঁদ যেদিন যে নক্ষত্রে থাকে সেদিনের নক্ষত্র সেটিই। জন্মমুহূর্তে রাশিচক্রে গ্রহদের অবস্থান বিশেষ

চাঁদ যে মাসে যে নক্ষত্রে ও রাশিতে থাকে

ক্রমিক	নক্ষত্র	মাস	নক্ষত্রটি যে নক্ষত্রমণ্ডলে
১	অশ্বিনী	অশ্বিনী	মেষ রাশি (১ নং)
২	ভরনী	—	মেষ রাশি (১ নং)
৩	কৃত্তিকা (সাতভাই)	কার্তিক	বৃষ রাশি (কিছুটা মেষ) (২ নং)
৪	রোহিণী	—	বৃষ রাশি (২ নং)
৫	মৃগশিরা	অগ্রহায়ণ	কাল পুরুষ
৬	আর্দ্রা	—	কাল পুরুষ
৭	পুনর্বসু	—	মিথুন রাশি (৩ নং)
৮	পুষ্যা	পৌষ	কর্কট রাশি (৪ নং)
৯	অশ্লেষা	—	সামুদ্রিক সাপ
১০	মঘা	মাঘ	সিংহ রাশি (৫ নং)
১১	পূর্বফাল্গুনী	ফাল্গুন	সিংহ রাশি
১২	উত্তরফাল্গুনী	—	সিংহ রাশি
১৩	হস্তা	—	কাক
১৪	চিত্রা	চৈত্র	কন্যা রাশি (৬ নং)
১৫	স্বাতী	—	বুটেশ বা ভূতেশ
১৬	বিশাখা	বৈশাখ	তুলা রাশি (৭ নং)
১৭	অনুরাধা	—	
১৮	জ্যেষ্ঠা	জ্যৈষ্ঠ	বৃশ্চিক রাশি (৮ নং)
১৯	মূলা	—	
২০	পূর্ব-আষাঢ়	আষাঢ়	ধনু রাশি (৯ নং)
২১	উত্তর-আষাঢ়		ধনু রাশি
২২	শ্রবণা	শ্রাবণ	ঈগল
২৩	ধনিষ্ঠা	—	ডলফিন
২৪	শতভিষা	—	কুম্ভ রাশি (১১ নং)
২৫	পূর্ব-ভাদ্রপদ	ভাদ্র	পিগোসাস্
২৬	উত্তর-ভাদ্রপদ		পক্ষীরাজ
২৭	রেবতী	—	মীন রাশি (১২ নং)

বৈশিষ্ট্য বহন করে। তাকে বলে জন্মলগ্ন। ২৭টি নক্ষত্র পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রথমে প্রথম রাশি মেষের অশ্বিনীতে পরে ভরণী নক্ষত্রে। এরপর দ্বিতীয় রাশি বৃষের কৃত্তিকায়, পরে রোহিনীতে, এইভাবে পরিক্রমা। **লক্ষণীয় যে ১০ নং রাশি মকরে ২৭ নক্ষত্রের কোন নক্ষত্র নেই।**

রাশির আকৃতিতে যে সমস্ত জন্তু ও বস্তুর আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে, তাদের বৈশিষ্ট্যও জাতকের মধ্যে সঞ্চারিত হয় বলে ভাবা হয়েছে। যেমন মেষরাশির জাতক মেষের মত একগুঁয়ে, বৃষের স্বভাব কাউকে গ্রাহ্য না করা, সিংহের বৈশিষ্ট্য সাহসী, কন্যার নারী সুলভ।

ফলিত জ্যোতিষ

কোনো বিষয়ের আগে ফলিত (applied) কথা যোগ হলে মানুষের কাছে যেন বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে যায়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও জ্যোতিষশাস্ত্রকে আধুনিক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ফলিত অর্থাৎ যা ঘটছে তাকে ঘর, ছকের মত গণিত বিষয় দিয়ে গণনা করার ভঙ্গিমা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার এক জবরদস্ত উপায়। নিচের জ্যোতিষের এই ছক দিয়েই বোঝা যাক—

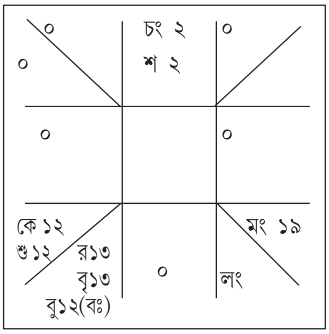

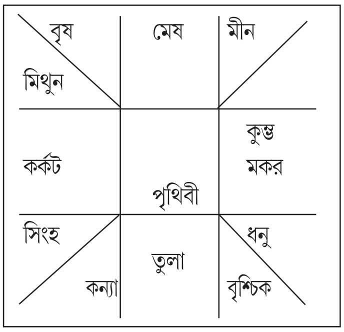

ছকের মধ্যে ১২টি রাশির ১২টি ঘর। চ-চন্দ্র, শ-শনি। জাতকের জন্মের সময় চন্দ্র ও শনি উভয়েই মেষ রাশির দ্বিতীয় নক্ষত্রে অর্থাৎ ভরণী নক্ষত্রে অবস্থান করছিল। পরবর্তী তিনটি ঘরে '০' অর্থাৎ ঐ তিনটি রাশিতে জন্মের সময় কোনো গ্রহ অবস্থান করছিল না। এরপর 'কেতু ও শুক্র সিংহ রাশিতে, ১২তম নক্ষত্র অর্থাৎ উ: ফাল্গুনীতে। মঙ্গল ধনুতে এবং বৃশ্চিকের ১৯তম নক্ষত্র মূলাতে। রাহু কুম্ভ রাশিতে ও ২৫তম নক্ষত্র পূর্ব ভাদ্রপদে। রবি, বৃহ, বুধ যথাক্রমে ১৩তম উ: ফাল্গুনীতে। উল্লেখিত ছক অনুযায়ী জাতকের রাশি মেষ, লগ্ন (লং) বৃশ্চিক।

জ্যোতিষের অসারতা

১. গ্রহনক্ষত্র ও মানুষের মধ্যে যে দুটি বল কাজ করে তা হল মহাকর্ষ ও তড়িৎ চুম্বকীয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি শুধু আয়নায়িত বস্তুর মধ্যে ঘটে। পৃথিবী, মানুষ, গ্রহ, নক্ষত্র কেউ আয়নায়িত (charged) নয়। থাকল শুধু মহাকর্ষ বল যা দূরত্ব ও বস্তুর ভরের উপর নির্ভর করে। গ্রহ নক্ষত্রেরা এত দূরে, ফলে মানুষের প্রতি তাদের আকর্ষণ (মহাকর্ষ) মানুষের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণের (অভিকর্ষ) তুলনায় নগণ্য। তাছাড়া মহাকর্ষ বল তো বিশ্বজনীন, অপরিবর্তনীয়। প্রত্যেক মানুষের উপর তার একই রকম প্রভাব। যদি তারতম্য ঘটে সে মানুষের ওজনের জন্য। মানুষের সেই ওজনও তো বিবেচ্য নয় জ্যোতিষশাস্ত্রে। তাহলে মানুষের ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব— ব্যাপারটা ছেলেমানুষী হয়ে গেল নাকি? চন্দ্র ও গ্রহগুলি থেকে কোনো রশ্মি নয়, শুধু আলো আসে, সেও সূর্যেরই আলো প্রতিফলিত হয় এবং তা নগণ্য। একমাত্র চন্দ্র ও সূর্য তাদের মহাকর্ষ, আলো ও তাপ দিয়ে পৃথিবীর আবহাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, ভাগ্যকে নয়। মহাকর্ষ ছাড়া যা কিছু মহাজাগতিক রশ্মি, আলোকরশ্মি, ইনফ্রারায়েড, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, বেতার তরঙ্গ বা কোয়াসার, নিউটন তারা থেকে পালসার বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, আলফা রশ্মি, গামা রশ্মি সবই বিপুল অন্তহীন মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে ক্ষীণভাবে প্রবেশ করে, কোনো গ্রহ থেকে নয়। সেও অতি নগণ্য। তাদেরও প্রভাব সর্বজনীন। সব মানুষের ক্ষেত্রেই এক। সেই রশ্মি যদি কোনো মহিলার শ্বশুরবাড়ির শান্তি স্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াই বলুনতো।

২. সবচেয়ে লজ্জাজনক— জ্যোতিষশাস্ত্র আজও টলেমির পৃথিবী কেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের প্রাচীন ধারণায় বন্দী হয়ে আছে। পৃথিবীর চারপাশে সূর্য ঘুরছে। অর্থাৎ পুরো জ্যোতিষশাস্ত্রই তো একটা মস্ত ভুলের স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

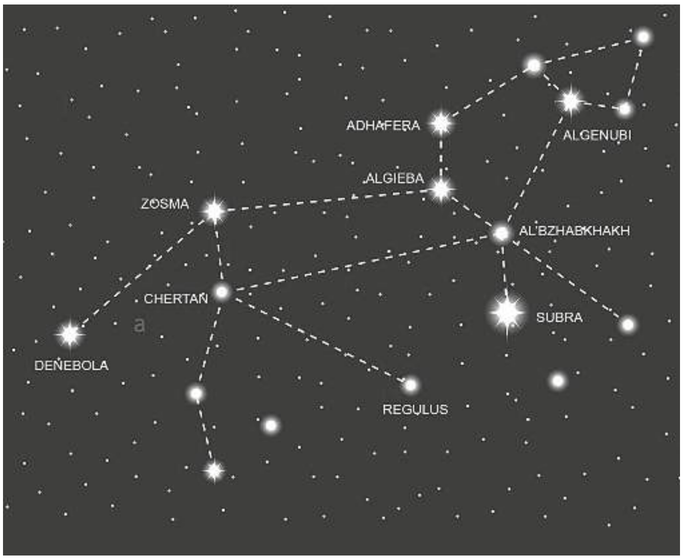

সিংহ রাশি

৩. আরো আশ্চর্যের—সূর্য, চন্দ্র উভয়েই নবগ্রহের একটি গ্রহ। টেলিস্কোপ ছিল না বলে ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো আছে এটা জানা ছিল না। তাই তাদের কোনো প্রভাবও নেই। খালি চোখে দেখা যায় না, তাই তাদের এই শাস্তি। তাদের বাদ দিয়ে যে হিসেব, তা কীভাবে বিশ্বাসযোগ্য হবে? আরো হাস্যকর—রাহু কেতুর খাতির। চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণে চাঁদ, সূর্যকে কে ঢেকে দিচ্ছে, জানা না থাকায় তাদেরও দুটি আসন দিয়ে দেওয়া হল। এছাড়া টেলিস্কোপ না থাকায় শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনিদের উপগ্রহরাও অচ্ছ্যুৎ হয়ে রইল। ভুলে ভরা এই হিসেবের ওপর দাঁড়িয়ে যুগযুগ ধরে টিকে আছে এই শাস্ত্র। তখন মনে হয়—মনের মস্তিষ্ক কি এতটাই অপরিণত।

৪. রাশিচক্রের মাত্র ১৬° চওড়া আকাশের মধ্যে পরিক্রমারত গ্রহতারারাই শুধু বিবেচিত হল। এই সামান্য এক ফালি আকাশের বাইরে সারা আকাশ জুড়ে এত নক্ষত্র, ১ কোটি ৭৪ লক্ষ ২৫ হাজার ১৭০টি রাশি—এরা সবাই পঙ্গু, অকর্মণ্য, তেজহীন! রাশিচক্রের অনেক নক্ষত্র পৃথিবী থেকে বহুদূরে যেমন ২৭ নক্ষত্রের জ্যেষ্ঠা (বৃশ্চিক) ৩৬০ আলোকবর্ষ দূরে, চিত্রা (কন্যারাশি) ২৭৫ আ:ব: দূরে আর আর্দ্রা (কালপুরুষ) ১৯০ আ:ব: দূরে। অথচ রাশিচক্রের বাইরে পৃথিবীর নিকটতম ও আকাশের তৃতীয় উজ্জ্বলতম তারা সেনটাউরি মাত্র আ:ব: দূরে। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধক মাত্র আ:ব: দূরে—এদের কোনো প্রভাবই বিবেচ্য নয়। আকাশের সপ্তম উজ্জ্বল তারা বানরাদা (কালপুরুষ) একটি দৈত্য তারা, যার মধ্যে দশ হাজার সূর্য ধরে যাবে, সেও অপদার্থ! আবার দেখুন চিত্রা (২৭৫ আ:ব:) আয়তনে সূর্যের দ্বিগুণ অথচ লুব্ধক (আ:ব:) চিত্রার দুজনেরও বেশি আয়তন নিয়ে এত কাছে থেকেও জ্যোতিষশাস্ত্রের জাদু কাঠিতে প্রভাবহীন। শুধু তাই নয়, ধনুরাশির কাছে সাদা ধোঁয়ার মত ছায়াপথের যে কেন্দ্র, যার বিপুল টানে ছায়াপথের দশ হাজার কোটি তারা ঘুরে চলেছে, সেও প্রভাবহীন। অথচ মকর, কুম্ভ ও মীন রাশির অতি ক্ষীণ তারাগুলিও দৈবশক্তি ধরে!

৫. ১২টি রাশির প্রতিটিকে তার আকৃতি অনুযায়ী কোনো জন্তু বা বস্তু কল্পনা করা হয়েছে। এটা নেহাতই এক আকস্মিকতা। অথচ সিংহের মত দেখতে সিংহরাশির প্রভাবে জাতক সিংহের মত সাহসী হবে—এটা শিশুদের পুতুল খেলা নয় কি! এছাড়া আমরা যে আকাশ দেখি সেটি ত্রিমাত্রিক নয়, দ্বিমাত্রিক, ফলে নক্ষত্রদের মধ্যে দূরত্ব পৃথিবীর দিক থেকে দেখা, প্রকৃত দূরত্ব নয়। মহাকাশের অন্য কোনো অবস্থান থেকে হয়ত সিংহকে ইঁদুর দেখব, কিংবা সিংহ ভেঙ্গে গিয়ে তারাগুলো কিছুই গড়ে তুলবে না। একটি রাশির বিভিন্ন তারা আবার বহুদূরের বিভিন্ন তলে রয়েছে। কোনো একটি রাশির সম্মিলিত সামগ্রিক প্রভাব কীভাবে সম্ভব? যেমন মকর রাশির ∝ তারা ১৬০০ আলোকবর্ষ দূরে, আর ∂ তারা মাত্র ৪৯ আলোকবর্ষ। পৃথিবী থেকে একই দিকে থাকার জন্য শুধু কাছে লাগে। তাই সম্মিলিত প্রভাব কি আদৌ সম্ভব। আবার কোনো একটি রাশির একটি তারা পাশের রাশির একটি তারার খুব কাছে আছে অথচ নিজের রাশির তারার থেকে দূরে। যেমন মেশরাশির অশ্বিণী (৪৬ আ:ব:) আর বৃষরাশির অ্যালহেকো (৪৯০ আ:ব:) রোহিনী থেকে বহুদূরে হয়েও সম্মিলিত ভাবে বৃষরাশি তৈরি করছে। সেই বৃষ কি তাহলে আদৌ কাউকে গুঁতোতে পারবে? আর দ্বিমাত্রিক আকাশের এই অসম্পূর্ণ, আংশিক সত্য ছবির উপরই দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের ভাগ্য বিচার।

৬. পৃথিবীর মানুষের ওপর মঙ্গলের প্রভাবের ক্ষেত্রে পৃথিবী থেকে তার দূরতম (৩৭৮ মিলি কিমি) ও নিকটতম (৫৬ মিলি কিমি) দুই অবস্থানের জন্য কোনো তফাতের উল্লেখ নেই জ্যোতিষশাস্ত্রে। কারণ জ্যোতিষ তো জানে মঙ্গল পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে, সূর্যের নয়।

৭. আকাশের যে ছবি নিয়ে জ্যোতিষশাস্ত্র একদিন গড়ে উঠেছিল, তা কিন্তু আজ সেই অবস্থানে আর নেই। তা ক্রমাগতই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পৃথিবীর ভূমেরু শূন্যে এক বিশাল বৃত্ত রচনা করেছে ২৬ হাজার বছরে। আজ ধ্রুবতারা পৃথিবীর উত্তর

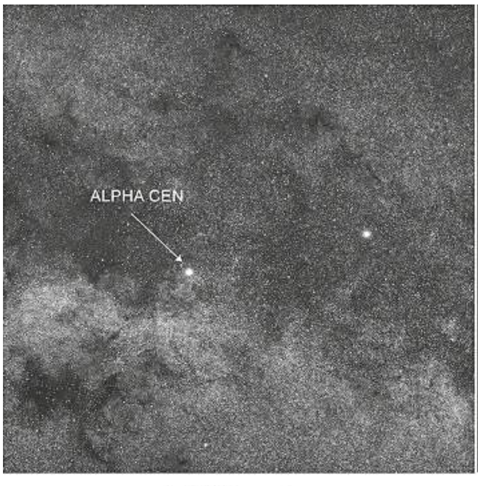

সেনটাউরির অবস্থান

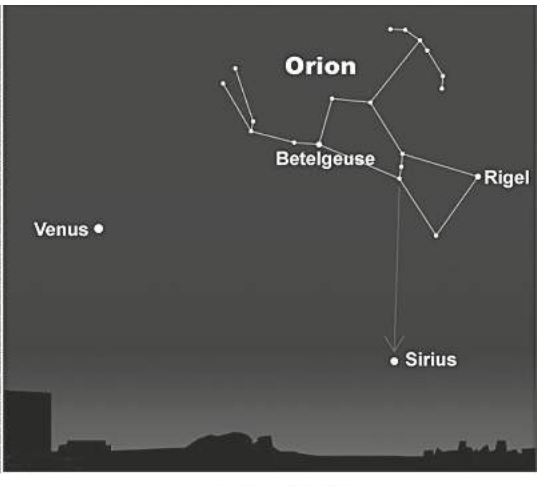

লুব্ধকের অবস্থান

দিক নির্দেশ করে। ২৬ হাজার বছর পর ঐ জায়গায় অভিজৎ নক্ষত্র এসে ধ্রুবতারা হবে। ৭ হাজার খ্রিস্টাব্দে সিফিয়াসের α তারাটি হবে ধ্রুবতারা। আবার ২৬ হাজার বছর পর এখনকার ধ্রুবতারা আবার হবে ধ্রুবতারা। অর্থাৎ ভূমেরু দুলছে, ফলে বিষুববৃত্তও দুলছে। ফলে ঐ যে ছেদবিন্দু, সেও চলেছে ক্রান্তিবৃত্ত ধরে পশ্চিমদিকে, বছরে ৫০.২৪ সেকেন্ড পরিমান। এই অয়ন গতির ফলে অর্থাৎ পৃথিবীর মাথা দোলানোর ফলে আজ থেকে দু হাজার বছর আগের রাশি ও নক্ষত্রের সমাবেশ প্রায় ৩° স্থানান্তরিত হয়েছে। তারই ফলে রাশিচক্রের প্রথমরাশি মেষরাশির আদি বিন্দু খ্রি:পূ: ৬০ দশকে অশ্বিণী নক্ষত্রে ছিল। আজ তা সরে এসেছে পিগেসাসের উ: ভাদ্রপদ নক্ষত্রে। এই অয়ন গতির দিকে উদ্দেশ্য করেই বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা বলেছিলেন—'বৈশাখ মাসে যেটাকে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন বলে মনে করা হচ্ছে, সেটা আদৌ সেদিন নয়, দিনটা এগিয়ে গেছে

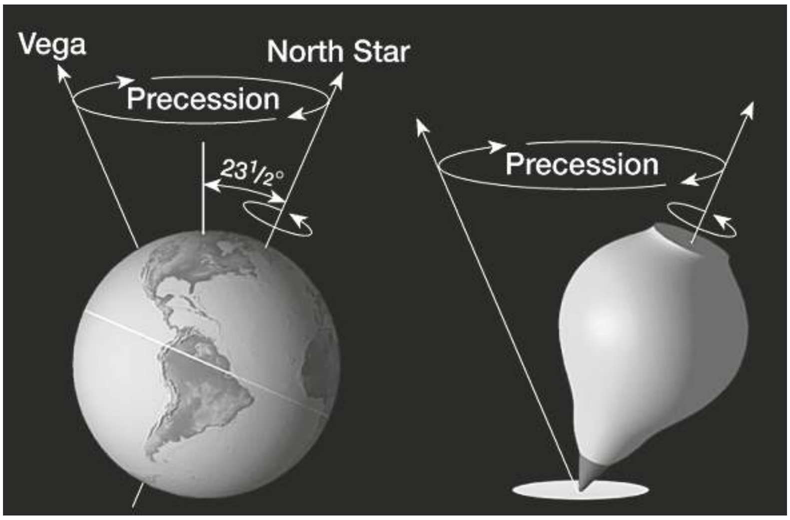

অয়ন গতি

চৈত্রমাসে। অথচ কোনো তফাৎ হয়নি জোতিষশাস্ত্রে। সেই পুরনো ছবির ওপরই সে দাঁড়িয়ে আছে অনড় ভাবে। কারণ সে নিরুপায়। এই গণনা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা পৃথিবী কেন্দ্রিক মানে তো গোড়াতেই ভুল!

এছাড়া ছায়াপথ তার কেন্দ্রের চারদিকে সেকেন্ডে ২৫০ থেকে ৩০০ কিমি বেগে ঘোরার ফলে আমাদের গ্যালাক্সির নক্ষত্রেরা নিজেদের থেকে কেউ কাছে যাচ্ছে, কেউ দূরে চলে যাচ্ছে। ২৭টি নক্ষত্রের একটি নক্ষত্র স্বাতী ২৫০ কিমি বেগে পৃথিবীর কাছে চলে আসছে। অথচ স্বাতী নক্ষত্রের প্রভাবের কোনো তারতম্য নেই।

৮. জ্যোতিষশাস্ত্রের এক বড় শূন্যগর্ভ ধারণা হল—জাতকের রাশি। জন্মমুহূর্তে চন্দ্র যে রাশিতে সেটি হল জাতকের রাশি। কেন, চন্দ্র কেন? সূর্য নয় কেন? সূর্য তো চন্দ্রের কোটিগুণ বড়। না, কোনো ব্যাখ্যা নেই। জন্মমুহূর্তে চন্দ্র যে রাশিতে থাকে, সেটি যদি পৃথিবীর প্রদক্ষিণ পথ থেকে অনেক দূরে থাকে অথবা পৃথিবীর অন্যদিকের আকাশে থাকে, তবু তার প্রভাব মাথার ওপরের উপস্থিত রাশির থেকেও শক্তিশালী? কেন? উত্তর নেই।

৯. জ্যোতিষ গণনায় জন্মমুহূর্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জন্মমুহূর্ত কোনটি? প্রথম ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত, নাকি শিশুর মাথা বেরোনোর মুহূর্ত। নাকি

জন্মমুহূর্ত কোনটি ?

মাতৃগর্ভে ডিম্বানু ও শুক্রানু মিলিত হয়ে ভ্রূণের জন্মমুহূর্ত। ভ্রূণের জন্মমুহূর্ত নয় কেন? রাশির প্রভাব তখনই তো উপস্থিত। ঘরের দেয়াল ভেদ করে রাশির প্রভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মাতৃজঠর ভেদ করা সম্ভব নয় কেন? জন্মমুহূর্ত ভেদে রাশিতো পাল্টে যাবে।

১০. আরেকটি মজাদার বিষয় হল যেসব নক্ষত্রের প্রভাব বিচার্য, তাদের অনেকেই হয়ত আজ আর বেঁচে নেই। হয়ত বহুযুগ বাদে তা আবিষ্কৃত হবে—আমরা নক্ষত্রের মৃত্যুর আগের আলোকরশ্মিকে দেখছিলাম। তবু জ্যোতিষশাস্ত্রে নক্ষত্রের প্রভাব অটুট থাকবে। এই বিষয়টি জ্যোতিষীদের জানা ছিল না। এমনও হতে পারে জাতকের যে রাশি, তার কোনো তারাই হয়ত আজ বেঁচে নেই। তাদের আলোকতরঙ্গ এখনও চলে আসছে। তাই দেখতে পাচ্ছি।

১১. জ্যোতিষীদের দাবি—ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত। ভাগ্য অপরিবর্তনীয়। এটি পূর্বজন্মের পাপ-পুণ্যের ফল অথবা জন্মমুহূর্তে নক্ষত্রের অবস্থান জনিত। তাহলে মেটাল ট্যাবলেট, রত্ন পাথর ভাগ্যকে পরিবর্তন করবে কীভাবে?

১২. জন্মগত কোনো সংকটে কারো হাত না থাকলে, আয়ুরেখাহীন মানুষটির কোনো আয়ু থাকবে না? জন্মাবার পরই মারা যাবে? একই পরিবারে যমজ সন্তান জন্মালে একই কুষ্ঠি তৈরি হয়। তাদের সারা জীবন ও ভাগ্যকে কি আমরা একই খাতে বইতে দেখি?

১৩. পৃথিবীতে যদি ৬০০ কোটি মানুষ থাকে, ১২টি রাশির প্রতি রাশিতে প্রায় ৫০ কোটি মানুষ চিহ্নিত হবে। তাহলে কোন নির্দিষ্ট দিনে কোনো রাশিতে বিদেশ ভ্রমণ থাকলে, একদিনে ৫০ কোটি মানুষের বিদেশ যাত্রা কিভাবে সম্ভব?

১৪. ৭০ বছর আগে ভারতীয়দের গড়পরতা আয়ু ছিল ৩০ বছর। আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০-এর ওপর। তাহলে কি ভারতীয়দের কোষ্ঠীতে মৃত্যুর জন্য দায়ী গ্রহগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যুযোগ—সে সময় কি তাহলে মহাকাশের গ্রহনক্ষত্রের কার্যকলাপে কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে?

email:gbandyo55@gmail.com • M. 9748127195

কালীপ্রসন্ন সিংহ

ভূত নাবানো

কালীপ্রসন্ন সিংহ [জন্ম : ১৮৪০, মৃত্যু : ১৮৭০]। রচনাটি 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' রচনার অংশবিশেষ

আর একবার যে আমরা ভূত নাবানো দেখেছিলাম, সেও বড় চমৎকার। আমাদের পাড়ার এক স্যাকরাদের বাড়িতে একজনের বড় ভয়ানক রোগ হয়; স্যাকরারা বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, সুতরাং রোগের চিকিৎসা কত্তে ত্রুটি কল্লে না, ইংরেজি ডাক্তার বদ্দি ও হাকিমের মেলা করে ফেললে; প্রায় তিন বৎসর ধরে চিকিৎসা হল, কিন্তু রোগের কেউ কিছুই কত্তে পাল্লে না, রোগ ক্রমশ বৃদ্ধি হচ্চে দেখে বাড়ির মেয়ে মহলে—তুলসী দেওয়া—কালীঘাটে সস্তেন—কাল ভৈরবে স্তব পাঠ—তুক্‌তাক্—সাফরিদ্—নারাণ—বালওড়—বালসী—শোপুর—নুরপুর ও হালুমপুর প্রভৃতি বিখ্যাত জায়গায় চন্নামেত্তো ও মাদুলি ধারণ হলো, তারকেশ্বরে হত্যে দিতে লোক গেল— বাড়ির বড় গিন্নী কালীঘাটে বুক চিরে রক্ত দিতে ও মাথায় ও হাতে ধুনো পোড়াতে গেলেন—শেষে একজন ভূতচালা আনা হয়।

ভূতচালার ভূতের ডাক্তারি পর্য্যন্ত করা আছে। আজকাল দু-এক বাঙালী ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেসেন্টের বাড়ি ভূত সেজে দেখা দেন—চাদরের বদলে দড়ি ও পেরেক সহিত মশারি গায়ে, কখনো বা উলঙ্গ হয়েও আসেন, কেবল মন্ত্রের বদলে চার-পাঁচ জন রোজায় ধরাধরি করে আন্তে হয়। এঁরা কল্‌কেতা মেডিকেল কালেজের এডুকেটেড্ ভূত।

ভূতচালা চণ্ডীমণ্ডপে বাসা পেলেন, ভূত আসবার প্রোগ্রাম স্থির হল— আজ সন্ধ্যার পরেই ভূত নাব্বেন, পাড়ার দু-চার বাড়িতে খবর দেওয়া হল— ভূত মনের কথা ও রুগীর ঔষধ বলে দেবে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যাল, কুঠিওয়ালারা ঘরে ফিল্লেন— বারফট্‌কারা বেরুলেন, বিগ্রহরা উত্তরাঢ়ি কায়েতদের মত (দর্শন মাত্র) সেতল খেলেন, গির্জ্জের ঘড়িতে ঢং ঢং ঢং করে নটা বেজে গ্যাল, গুম্ করে তোপ পড়্‌লো। ছেলেরা 'ব্যোম্‌কালী কল্‌কেতাওয়ালী' বলে হাততালি দে উঠ্‌লো— ভূতনাবানো আসরে নাব্‌লেন।

আমাদের প্রতিবাসী ভূত নাবানোর কথা প্রমাণ ও বাড়ির গিন্নীদের মুখে শুনে ভূতের আহার জন্য আয়োজন কত্তে ত্রুটি করে নাই; বড়বাজারের সমস্ত উত্তমোত্তম মেঠাই; ক্ষীরের নানা রকম পেয় ও লেহ্যরা পদার্পণ করেন— বোধ হয়, আমাদের মত প্রকৃত ফলারের দশজনে তাঁদের শেষ কত্তে পারে না, রোজা ও তাঁর দুই চেলায় কি কর্ব্বেন! রোজা ঘরে ঢুকে একটি পিঁড়েয় বসে ঘরের ভিতরে সকলের পরিচয় নিতে লাগ্‌লেন— অনেকের আপাদমস্তক ঠাউরে দেখে নিলেন— দুই একজন কলেজবয় ও মোটা মোটা লাটিওয়ালা নিমন্ত্রিতদের প্রতি তাঁর যে বড় ঘৃণা জন্মেছিল, তা তাঁর সে সময়ের চাউনিতেই জানা গ্যালো।

রোজার সঙ্গে দুটি চ্যালামাত্র, কিন্তু ঘরে প্রায় জন চাল্লিশ ভূত দ্যাখবার উমেদার উপস্থিত, সুতরাং ভূত প্রথমে আস্‌তে অস্বীকার করেছিলেন, তদুপলক্ষে রোজাও 'কাল ও কৃশচানীর' উপলক্ষে একটু বক্তৃতা কত্তে ভোলেন নাই— শেষে দর্শকদের প্রগাঢ় ভক্তি ও ঘরের

আলো নিবিয়ে অন্ধকার কর্‌বার সম্মতিতে রোজা ভূত আন্‌তে রাজী হলেন— চ্যালারা খাবার দাবার সাজানো থালা ঘেঁসে বস্‌লেন, দরজায় হুড়কো পড়্‌লো— আলো নিবিয়ে দেওয়া হল; রোজা কোশা-কুশি ও আসন নিয়ে শুদ্ধাচারে ভূত ডাক্‌তে বললেন, আমরা ভূতের ভয়ে আড়ষ্ঠ হয়ে বারোইয়ারির গুদোমজাৎ সংগুলির মত অন্ধকারে বসে রইলেম!

পাঠক। আপনার স্মরণ থাক্‌তে পারে, আমরা পূর্ব্বেই বলেচি যে, আমাদের ঠাকুরমা ভূত ও পেত্নীর ভয় নিবারণের জন্যে একটি ছোট জয়ঢাকের মত মাদুলিতে ভূকৈলেসের মহাপুরুষের পায়ের ধুলো পুরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দ্যান, তা সওয়ায় আমাদের গলায় গুটি বারো রকমারি পদক ও মাদুলি ছিল, দুটি বাঘের নখ ছিল, আর কুমীরের দাঁত, মাছের আঁশ ও গণ্ডারের চাম্‌ড়াও কোমরের গোটে সাবধানে রাখা হয়। আর হাতে একখানা বাজুর মত কবচ ও তারকেশ্বরের উদ্দেশে সোনার তাগা বাঁধা ছিল। খুব ছেলেব্যালা আমাদের একবার বড় ব্যায়রাম হয়, তাতেই আমাদের পায়ে চোরের সিঁদের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় ও মাথায় পঞ্চানন্দের একটি জট্‌ থাকে; জট্‌টি তেল ও ধুলোতে জড়িয়ে গিয়ে রামছাগলেব গলার নুন্নশীর মত ঝুলতো, কিন্তু আমরা ইস্কুলের অবস্থাতেই অল্পবয়সে অ্যাম্‌বিশনের দাস হয়ে ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে একখানা ছাবানো হেডিংওয়ালা কাগজে নাম সই করি; তাতেই শুন্‌লেম যে আমাদের ব্রাহ্ম হওয়া হল, সুতরাং তারই কিছু পূর্ব্বে ইস্কুলের পণ্ডিতের মুখে মহাপুরুষের দুর্দশা শুনে পূর্ব্বোক্ত কবচ, মাদুলী প্রভৃতি খুলে ফেলেছিলেম, আজ সেগুলির আবার স্মরণ হল। মনে কল্লেম যদি ভূত নাবানো সত্যিই হয়, তাহলে সেইগুলি পরে আসতে পাল্লে ভূতে কিছু কত্তে পারবে না— এই বিবেচনা করে সেইগুলির তত্ত্ব কল্লেম, কিন্তু পাওয়া গেল না— সেগুলি আমাদের পৌত্তরে ভাতের সময় একটা চাকর চুরি করে; চুরিটি ধরবার জন্য চেষ্টারও ক্রটি হয়নি— গিন্নী শনিবারে একটা সুপুরি, পয়সা ও সওয়া কুন্‌কে চালের মুদো বাঁদেন; ন্যেপীর মা বলে আমাদের বহু কালের এক বুড়ি দাসী ছিল, সে সেই মুদোটি নে জানের বাড়ি যায়— জান গুণে বলে দ্যায় ‘চোর বাড়ির লোক, বড় কালোও নয় বড় সুন্দরও নয়— শ্যামবর্ণ, মানুষটি, একহারা মাজারি গোঁফ, মাথায় টাক্‌ থাক্‌তেও পারে না থাকতেও পারে।’ জানের গোনাতে আমাদের ওই চাকরটিকেই চোর স্থির করে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়, সুতরাং সে মাদুলিগুলি পাওয়া গ্যাল না, বরং ভূতের ভয় বেড়ে উঠ্‌লো।

ব্রাহ্ম হলেও যে ভূতে ধরবে না, এটিরও নিশ্চয় নাই! সে দিন কল্‌কেতার ব্রাহ্মসমাজের একজন ডাইরেক্‌টরের স্ত্রীকে ডাইনে পায়— নানা দেশ দেশান্তর থেকে রোজা আনিয়ে কত ঝাড়ান-ঝোড়ান, সর্‌ষে পড়া, জল পড়া ও লঙ্কা পড়া দিতে ভাল হয়— অনেক ব্রাহ্মের বাড়িতে ভুতচতুর্দ্দশীর প্রদীপ দিতে দেখা যায়।

এদিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাক্‌তে ডাক্‌তে ভূতের আসবার পূর্ব্বলক্ষণ হতে লাগ্‌লো; গোহাড়, ঢিল, ইট ও জুতো হাড়ি বাড়ির চতুর্দ্দিকে পড়তে লাগ্‌লে, ঘরের ভেতর গুপ্‌ গুপ্‌ করে য্যান কে নাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিকক্ষণ এই রকম ভূমিকার পর মড়াস্‌ করে একটা শব্দ হল, ভূতের বস্‌বার জন্যে ঘরের ভিতর যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েচিল, শব্দে বোধ হল সেইখানি দু-চির হয়ে ভেঙে গ্যাল— রোজা সভয়ে বলে উঠলেন— শ্রীযুৎ এয়েচেন।

আমরা ছেলেব্যালা আমাদের বুড়ো ঠাকুরমার কাছে শুনেছিলাম যে, ভুতে ও পেত্নীতে খোঁনা কথা কয়, সেটি আমাদের সংস্কারবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ তার পরীক্ষা হল— ভূত পিঁড়ে ফাটিয়েই খোঁনা কথা কইতে লাগলেন, প্রথমে এসেই কলেজবয়দের দলের দুই একজনের নাম ধরে ডাক্‌লেন, তাদের নাস্তিক ও কৃশ্চান বলে ডাক দিলেন, শেষে ভূতত্ত্বনিবন্ধন ঘাড় ভাঙবার ভয় পর্য্যন্ত দ্যাখাতে ক্রটি করেন নাই; ভূতের খোঁনা কথা ও অপরিচিতের নাম বলাতেই বাড়ির কর্ত্তা বড় ভয় পেলেন, জোড়হাত করে (অন্ধকারে জোড়হাত দেকা অসম্ভব, কিন্তু ভূত অন্ধকারে দিব্বি দেখতে পান, সুতরাং কর্মকর্ত্তা অন্ধকারেও জোড়হস্তে কথা কয়েছিলেন এ আমাদের কেবল ভাবে বোধ হল) ক্ষমা চাইলেন, কিন্তু ভূত স্যর মর্ডান্ট ওয়েল্‌সের মত যা ধরেন, তার সমুলচ্ছেদ না করে ছাড়েন না, সুতরাং আমাদের ঘাড় ভাঙবার প্রতিজ্ঞা অন্যথা হল না, শেষে রোজা ও বুড়ো বুড়ো দর্শক ও বাড়িওয়ালার অনেক সাধ্য সাধনার পর ভূত মহোদয় ষষ্ঠীবাঁটায় আগত জামাইয়ের মত যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ কত্তে সম্মত হলেন, আমরাও পালাবার পথ আঁচতে লাগ্‌লেম।

লুচির চট্‌কানো ও চিবোনোর চপর ও সাপটা ফলারের হাপুর হুপুর শব্দ থাম্‌তে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো, শেষে ভূত জলযোগ করে গাঁজা ও তামাক খাচ্চেন, এমন সময়ে পাশ থেকে ওলাউঠো রুগীর বমির ভূমিকার মত উঁকীর শব্দ শোনা যেতে লাগলো, ক্রমে উঁকীর চোটে ভূতের বাক্‌রোধ হয়ে পড়লো—বমি। হুড় হুড় করে—বমি। গৃহস্থ মনে কল্লেন, ভূত মাহশয় বুঝি বমি কচ্চেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়ে আনলেন। শেষে দেখি কি চ্যালা ও রোজা খোদই বমি কচ্চেন, ভূত সরে গ্যেচেন— আমরা পূর্ব্বে শুনিনে যে, গেরস্তর অগোচরে একজন মেডিকেল কালেজের ছোকরা ভূতের জন্যে সংগৃহীত উপচারে টারটামেটিক্‌ এমেটিক* মিশিয়ে দিয়েছিলেন, রোজা ও চেলারা তাই প্রসাদ পাওয়াতেই তাঁদের এই দুর্দ্দশা; সুতরং ভূত নাবানোর উপর আমাদের যে ভক্তি ছিল, সেটুকু উবে গ্যাল। সুতরং শেষে আমরা এই স্থির কল্লেম যে, ইংরাজি ভূতেদের কাছে দিশী ভূত খবরে আসে না।

এ সওয়ায় আমরা আরও দু-চারি জায়গায় ভূত নাবানো দেকেচি, পাঠকরাও বিস্তর দেখেচেন, সুতরাং সে সকল এখানে উত্থাপন করা অনাবশ্যক, ‘ভূত নাবানো’ ও ‘হোসেন খাঁ’ কেবল জুচ্চুরি ও হুজুকের আনুষঙ্গিক বলেই আমরা উল্লেখ কল্লেম।

---

*Tartar emetic, এন্টিমনি ও পটাশিয়াম টারটারেট। এটি বমি করানোর ওষুধ।

অ নু প হা ল দা র

আন্তঃসীমান্ত নদী

গঙ্গা, পদ্মা ও মেঘনার বদ্বীপই হল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং উর্বর বদ্বীপ। হিমালয়ের নুড়ি, পাথর উর্বর পলি হয়ে ফিরে এসে গঠন করেছে এই ভূভাগ। এই বদ্বীপের শিরায় উপশিরায় প্রবাহিত হত নদী। আর এই নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সভ্যতা। সভ্যতার সমৃদ্ধির সাথে সাথে ভাগ হল ভূখন্ড। আসল কাঁটাতার। দেশভাগের সাথে সাথেই ভাগ হল মাটি, জল প্রভৃতি। যুগ-যুগান্তর ধরে প্রবাহমান নদীর মালিক হয়ে উঠল দুটি দেশই। দুটি দেশের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রমকারী প্রবাহমান জলধারাগুলি হয়ে গেল আন্তর্জাতিক নদী। আর এই আন্তর্জাতিক নদীগুলির রক্ষার জন্য দুটি দেশেই তৈরি হল পৃথক নদীমন্ত্রক এবং আন্তর্জাতিক নদী কমিশন। কিন্তু বাস্তবে নদীর স্বার্থরক্ষা হল কতদূর? তার উত্তর খুঁজতে ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রমকারী নদীগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

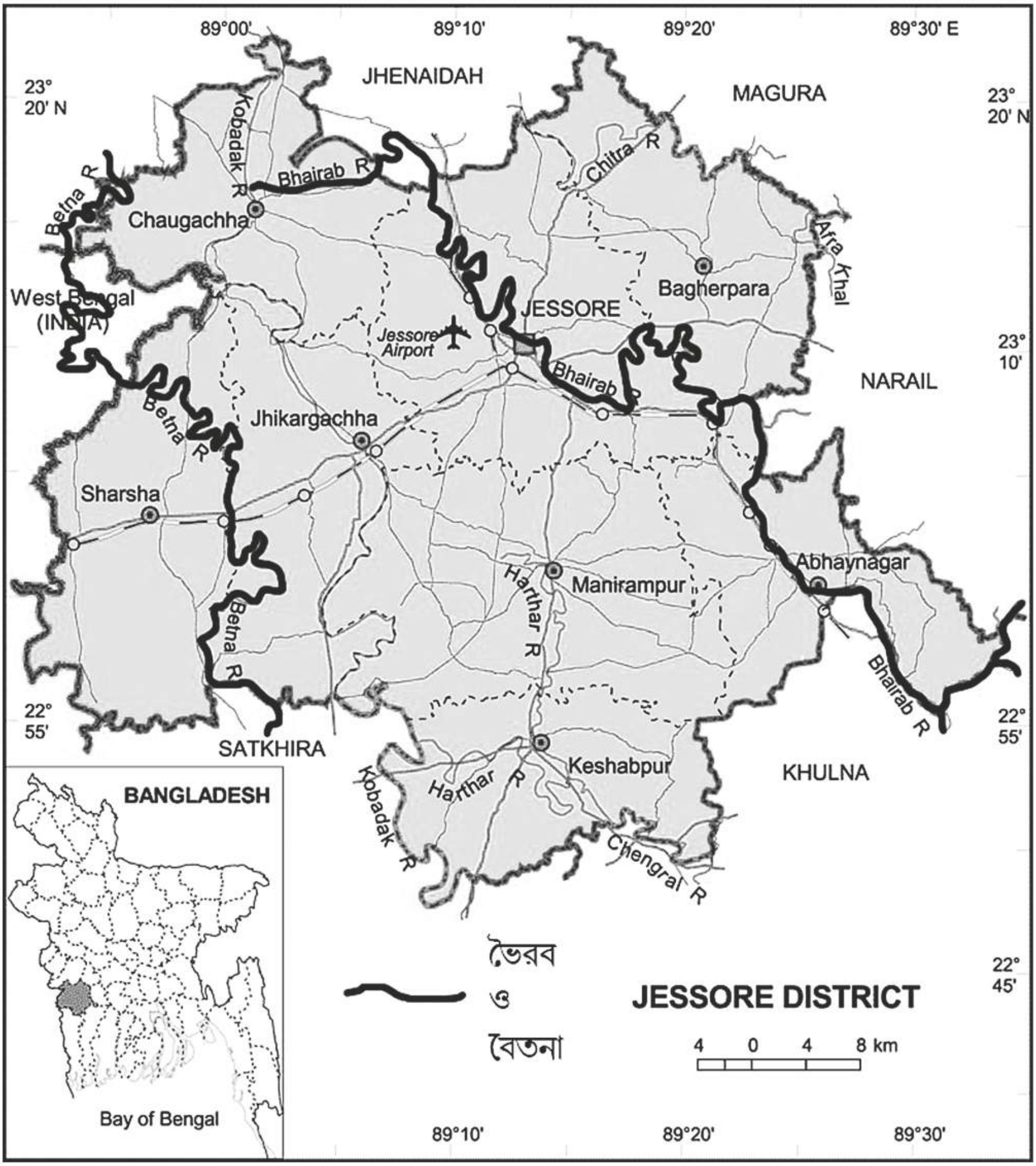

ভৈরব ও কপোতাক্ষ

ভৈরব ভারত ও বাংলাদেশের একটি আন্তর্জাতিক নদী। জলঙ্গী নদী থেকে ভৈরবের উৎপত্তি। আনুমানিক ২৪২ কি.মি. নদীটির দৈর্ঘ্য। ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার করিমপুর থানার নন্দনপুর গ্রাম ছাড়িয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে নদীটি। নদীটির বেশির ভাগ অংশই বাংলাদেশের সীমানায় প্রবাহিত। মেহেরপুর, চুয়াডাঙা, ঝিনাইদহ, যশোর খুলনা হয়ে বাংলাদেশের সুন্দরবনে পতিত হয়েছে নদীটি। বাংলাদেশের দিকে নদীটি পুরো দখল হয়ে গেছে। নদীর বুকে ধান চাষ চলছে পুরোকদমে। যশোর খুলনার যে অংশে জল আছে তা বদ্ধ নর্দমার ন্যায়। তাতে পৌর ও শিল্প বর্জ্যে পরিপূর্ণ। চুয়াডাঙার ধোপাখালি ছেড়ে ভৈরব যত দক্ষিণে যায় নদের প্রশস্ততা তত বাড়লেও নদী জুড়ে শুধুই কচুরিপানা, স্রোত তো বহুকাল আগে থেকেই স্তব্ধ। এরপর বাংলাদেশের কোটচাঁদপুর জেলা থেকে ভৈরব যশোর জেলায় প্রবেশ করেছে। এখানেই তাহেরপুর থেকে জন্ম নিয়েছে কপোতাক্ষ। কপোতাক্ষ মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত বহু প্রাচীন নদ। আনুমানিক ১৮০ কি.মি. দৈর্ঘ্য। যদিও ভারতবর্ষের সীমানায় খুব কমই প্রবাহিত নদীটি। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনার বয়রা থানার অন্তর্গত আন্তর্জাতিক সীমান্তের গা ঘেঁষে প্রবাহিত। কাগজে কলমে আন্তর্জাতিক নদী হলেও বর্তমানে ভারত এই নদীর কোনো সুবিধা ভোগ করতে পারে না। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকালেই চোখে পড়বে নদীটির প্রশস্ততা ৩০০ মি.-এর অধিক হলেও (দূরে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীদের ভবন ও মাটির ঢাল অন্তত সেই কথাই বলে) বাংলাদেশের দিক থেকে চাষের জমি ক্রমাগত এগিয়ে আসতে আসতে নদীটিকে পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। বর্তমানে নদীর দৈর্ঘ্য এখানে মেরেকেটে ৭১৮ ফুটের বেশি হবে না। বর্ষায় জল বাড়লে নদীর জলে ভারতীয় চাষি, মৎস্যজীবি, সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতেন, তবে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ভারতীয়দের কোনোভাবেই এই জল ব্যবহার করতে দেন না। কপোতাক্ষ নদের বুকে একাধিক মাছের ভেড়ি করে মাছ চাষ করছে বাংলাদেশ। ফলে কচুরিপানায় আবদ্ধ নদী মশার আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। ম্যালেরিয়া ডেঙ্গুর প্রভাবে ভীষণভাবে আক্রান্ত এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। প্রশাসন নিরুত্তাপ।

বেতনা বা কোদালিয়া নদী

বেতনা বা কোদালিয়া নদী ভারত ও বাংলাদেশের একটি আন্তঃসীমান্ত নদী। দৈর্ঘ্য ১৯১ কি.মি. (আনুমানিক)। বেতনা নদীটির উৎপত্তি বাংলাদেশের ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার কাছে ভৈরব নদ থেকে। নদীটির বর্তমানে পুরোটাই বাংলাদেশে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ আন্তর্জাতিক সীমান্তের ধার ঘেঁষে বেশ কিছুটা প্রবাহিত। আর বনগাঁ থানায় বেশ কিছুটা অঞ্চলে নদীটি ৫/৬ বার ভারত সীমান্ত ছুঁয়ে, আবার বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বলা যায় ভারত সীমান্তে নদীটির প্রবাহ সর্পিলাকার। বাংলাদেশে প্রবাহিত নদীটির ১৫০ কি.মি.-এর মধ্যে মাত্র ২০ কি.মি. নদী জীবিত, বাকি ১৩০ কি.মি. নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুষ্কর (সূত্র দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকা ২৩ জুলাই ২০১৯ বাংলাদেশ)। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রাম সুটিয়া। নদীর এপারে ভারত ওপারে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা লাগোয়া ব্রিজে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের দিকে তাকালেই প্রথমে চোখে পড়ে সীমানার ওপারে (বাংলাদেশের দিকে) ১০০/১২৫ ফুট ভেতরে পুরো নদী জুড়ে একটি স্লুইস গেট তৈরি করেছে বাংলাদেশ (স্বভাবতই বর্ষার জল ধরে রাখার জন্য)। স্লুইস গেটের পূর্বদিকে নদীর পারে দাঁড়ালেই চোখে পড়বে। অপরদিকে (বাংলাদেশের দিকে) নদীর ঢাল দেখে অনুমান করা যায় অন্তত ৪০০ ফুট নদীটির প্রশস্ততা ছিল। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের দিক থেকে চাষের জমি দিনে দিনে নদীখাত গ্রাস করে নিচ্ছে। বর্তমানে নদীর ৪/৫ ফুট অবশিষ্ট আছে। এরপর ভারতবর্ষের ভেতর নদীটি যত প্রবেশ করেছে তত এর প্রশস্ততা ও গভীরতা দুটোই বেড়েছে। বাঙলানী ও বাগানগা গ্রামে নদীটি ১০০/১৫০ মি.-এর মত প্রশস্ত, গভীরতা প্রায় ৭ ফুট। আষাঢু অঞ্চলে নদীর প্রশস্ততা প্রায় ৫০০ ফুটেরও অধিক, গভীরতা ৭/৮ ফুটের মত, তবে উৎসমুখ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নদীটি স্রোতহীন।

দূষণে বিপর্যস্ত বেতনা নদী *ছবি : অনুপ হালদার*

আন্তর্জাতিক নদীগুলির ওপর ভারত ও বাংলাদেশের উভয়েরই সমান অধিকার, জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক জলনীতি দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু আন্তর্জাতিক নদীগুলির ক্ষেত্রে উভয় দেশেরই উদাসহীন মনোভাব সীমান্তবর্তী জেলাগুলির এবং মূল নদীর সাথে শাখানদী ও উপনদীগুলির অস্তিত্ব আজ সঙ্কটাপন্ন। এবং ধীরে ধীরে সেটি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে। প্রাকৃতিক নদী ব্যবস্থায় মানুষের এই বিশাল হস্তক্ষেপ বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করবে। আন্তঃসীমান্ত নদীগুলির জীববৈচিত্র আজ বিবিধ কারণেই হুমকির মুখে। জলপ্রবাহে বাধা, পলিপড়া, নদীদূষণ, দখল-এর ফলে নদীগুলির বাস্তুতন্ত্র, জীববৈচিত্রি, ভূগর্ভস্থ জলে এবং পরিবেশেও দীর্ঘমেয়াদি ও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নদীগুলির দূরাবস্থা পরিবর্তন ও উন্নয়ন করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হলেও দুটি দেশেরই প্রয়োজন এই আন্তর্জাতিক নদীগুলির ক্ষেত্রে অন্তত এক হয়ে কাজ করা, তাহলেই বাঁচবে নতুন প্রজন্ম। নতুবা ভয়ঙ্কর দিন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

email:anuphalderkly@gmail.com • M. 9143264159

চিঠি চিঠি চিঠি

সম্পাদক সমীপেষু ‘বিজ্ঞান অন্বেষক’

চতুর্দিকে অতিমারীর বিষবাষ্প। কুণ্ঠাবোধ হয় পথ চলতে। বড় একটা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমরা। কোভিড-১৯-এর সংক্রমণ শনৈঃ শনৈঃ বাড়ছে প্রতিনিয়ত। একপ্রকার বন্দিদশায় রয়েছি আমরা সকলেই। তাই আমরা অর্থাৎ আট থেকে আশি প্রায় সকলেই মনের গীতবিতান বা পড়ার অভিজ্ঞান খুঁজে পাই একটু স্মার্টফোনে। করোনা ভাইরাসের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে হাতে পেলাম গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা ‘বিজ্ঞান অন্বেষক’-এর মুদ্রিত সংস্করণ। মন ভালো করা একটা ভিন্ন স্বাদের অভিযান চলল পাঠ প্রক্রিয়ায়। এক্ষেত্রে সম্পাদক এবং সম্পাদকমণ্ডলীকে কুর্নিশ জানাতেই হবে। এমন দুঃসময়ে পত্রিকা প্রকাশ করা সহজ ব্যাপার নয়। যাইহোক, ৪৮ পৃষ্ঠার ‘বিজ্ঞান অন্বেষক’ (মে-অগস্ট ২০২০) সত্যিই এ সময়ের নানা বিজ্ঞান, সংস্কার এবং কুসংস্কারের জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে বলাই যায়। করোনা মুহূর্তে বিজ্ঞান চেতনা সমৃদ্ধ মনস্ক লেখা পাঠককে শুধু জ্ঞান আহরণই নয়, জানতে ও চিনতে চেষ্টা করাবে সঠিক মূল্যায়নটি। ডিজিটাল প্রচ্ছদে তাপস মজুমদার এবং অঙ্কনে সৌরভ মুখার্জীর প্রশংসা করতেই হবে। তাঁরা এই সংখ্যাটির সুন্দর আঙ্গিকে রূপদান করেছেন অতি যত্ন সহকারে।

সূচিটি আমার বেশ লেগেছে। নতুনত্ব আছে অন্যান্য পত্রিকার তুলনায়। এক নজরে গোটা বিষয়টি অনুধাবন করা যায় সহজেই। সম্পাদক তাপস মজুমদারের ‘করোনারি দিনলিপি’ বেশ তথ্যনির্ভর। কুসংস্কার থেকে মুক্তি এবং বাঁচার আলো খুঁজে পাবে পাঠক। ডা. সিদ্ধার্থ জোয়ারদারকে ‘করোনা ভাইরাস ও কোভিড-১৯ : গবেষণার আলোকে’ প্রবন্ধটির জন্য সত্যিই সাধুবাদ জানাতে হবে। অনেক তথ্যে পরিপূর্ণ লেখাটি সংগ্রহ করে রাখার মত। তবে করোনার টীকা বিষয়ক যে সারণী বা বৈশিষ্টগুলি তুলে ধরেছেন তাতে এখনো কেন আমরা করোনা টিকার সঠিক পদক্ষেপ তথা আবিষ্কার থেকে দূরে রয়েছি তা আলোচিত হওয়া দরকার। সুকল্যাণ গাইনের ‘মহামারী অতিমারী : বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে’ লেখাটিতে অনেক অজানা ইতিহাস উঠে এসেছে। লেখায় বেশ সাবলীল ধারা বজায় রয়েছে। মহামারী, দুর্ভিক্ষ বা কোয়ারেন্টাইন অঞ্চল অতীতে যে ছিল তা ‘শ্রীকান্ত’ উপন্যাস বা প্লেগ সংক্রমণের মাধ্যম ইঁদুর, যার ‘বুবোনিক’ নাম দেশের বাইরেও যে দেখা দিয়েছিল তার ইতিহাস সত্যিই এটি না পড়লে অজানা থেকে যেত। ব্ল্যাক ডেথ মহামারীও ইতালিতে হয়েছিল। কিংবা স্প্যানিশ ফ্লু, এশিয়ান ফ্লু সম্বন্ধে সমগ্র লেখাটি ‘সাল-তারিখ’ উল্লেখ করে পুঙ্খানুপুঙ্খ অন্বেষক হয়ে উঠেছে।

নন্দগোপাল পাত্র, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়, পান্না মানি প্রভৃতিদের লেখায় কোভিড-এর ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা পাঠককে আকৃষ্ট করবেই এবং কোভিড সম্পর্কে সচেতন তথা অনেক অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে।

২০২০ সাল ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল-এর দ্বিতশত জন্মবর্ষ একথা আমরা সকলেই জানি। ডা. শঙ্কর কুমার নাথ মহাশয়ের ‘ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ও তাঁর স্বাস্থ্যবিধির তত্ত্ব’ বিষয়ক লেখাটি যদি আরেকটু বিস্তারিত হত তথা ফ্লোরেন্স-এর জীবনকথা উঠে আসত তাহলে আরেকটু প্রাণবন্ত হত।

ড. ভবানী প্রসাদ সাহুর লেখার বিষয় দেখে মুখে হাসি তো এসেই যায়। বেশ আগ্রহের সাথে পড়লাম। সুপারস্টিশন তথা অন্ধবিশ্বাস, মিথ্যার আরোপ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায় সমাজকে কীভাবে এসব কলুষিত করছে—এটি না পড়লে বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসবে না। সহজ সরল বৃত্তে সাধারণের মানুষের দৃষ্টিগোচর করেছেন।

করোনা নিয়ে কবিতাগুলি বেশ উচ্চমার্গের। ছটি কবিতাই হৃদয় জুড়ে বসেছে। মনকে নাড়া দেয়, মানবিক চেতনাকে উজ্জীবিত করে।

শেষ প্রবন্ধ অনুপ হালদারের ‘লকডাউনে কেমন আছে নদীরা’ বেশ সাবলীল। দূষণমাত্রা কমা কিংবা সভ্যতার সম্পদ নদীকেন্দ্রিক লেখাটিও অল্পের মধ্যে ব্যতিক্রমী।

সবশেষে আবারও বলতেই হয় ‘বিজ্ঞান অন্বেষক’-এর আলোচ্য সংখ্যাটির প্রতিটি লেখাই সুন্দর বিশ্লেষণধর্মী মননশীলতায় উজ্জ্বল। এতগুলো ভালো প্রবন্ধ এই মুহূর্তে একটি সংখ্যায় একসাথে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর বটে। প্রবন্ধই হচ্ছে জ্ঞানের আধার। তবে প্রবন্ধগুলো পড়ে আমি সত্যিই ঋদ্ধ হলাম একথা অকপটেই স্বীকার্য।

শুভেচ্ছাসহ—

কুশল মৈত্র

২০.১০.২০২০ সম্পাদক ‘মৈত্রীদূত’

email:kushalmaitra78@gmail.com • M. 9331999133

পরিবেশ ডট কম

বাংলা ভাষায় পরিবেশ ও বিজ্ঞানের
একমাত্র চ্যানেল ও পোর্টাল

Mobile - 9051222813
Email - poribesnews@gmail.com
Website - www.poribes.com

A Well Wisher :–

সব কিছুতেই খুঁজব কারণ, অন্ধভাবে মানব না।
বিজ্ঞানকে বইয়ের পাতায় বন্দী করে রাখবো না।

রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী | নীলগিরি লাঙ্গুর

সাধারণ ইংরেজি নাম ঃ *Nilgiri Langur*
বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Semnepithecus johnii*

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার নীলগিরি পাহাড় বনাঞ্চলে কেবলমাত্র দেখা যায় এই প্রাচীন বিশ্বের বানরকে। কর্নাটকের কোদাগু জেলা, তামিলনাড়ুর কোদায়ার পাহাড় এবং কেবল তামিলনাড়ু সংলগ্ন পাহাড়ি অঞ্চলে এদের বিস্তৃতি। ৯ থেকে ১০টি বানর এক-একটি দলে বসবাস করে। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে ব্যাপক শিকার করা হয়েছে যার দরুন আজ মহাবিপন্ন এরা। যাইহোক IUCN-এ লাল তালিকা ঘোষণার পর এটি সংরক্ষণের আওতায়।

উভচর | অ্যাবের স্যালাম্যান্ডার

সাধারণ ইংরেজি নাম ঃ *Abe's Salamander*
বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Hynobius abei*

অত্যন্ত দুর্লভ এই স্যালাম্যান্ডার জাপানের হোন্‌সু প্রদেশের ফুকুই, কিওটো এবং হিয়োগো অঞ্চলে দেখা যায়। IUCN-এর Red Data Book অনুসারে এরা সংকটজনকভাবে বিপন্ন।

এদের সংরক্ষণের জন্য জাপান সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পক্ষী | নারকোনডাম ধনেশ

সাধারণ ইংরেজি নাম ঃ *Narcondam Hornbill*
বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Rhyticeros narcondami*

অত্যন্ত দুর্লভ প্রজাতির এই ধনেশটি কেবলমাত্র ভারতের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়। আন্দামানের নারকোনডাম দ্বীপের বাসিন্দা এই ধনেশ এশিয়া মহাদেশে প্রাপ্ত সকল ধনেশের চেয়ে কম সংখ্যায় কেবলমাত্র এই দ্বীপেই পাওয়া যায়। IUCN-এর তালিকায় এরা মহাবিপন্ন। এরা মুহূর্তে সর্বসাকুল্যে ৪০০-এর মত সংখ্যায় বেঁচে আছে।

অমেরুদণ্ডী | ট্রি-নিম্ফ প্রজাপতি

সাধারণ ইংরেজি নাম ঃ *Tree Nymph Butterfly*
বিজ্ঞানসম্মত নাম ঃ *Idea malabesrica*

দক্ষিণ ভারতের পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় এদের বসবাস। ভারতের বড় বড় প্রজাপতিগুলির মধ্যে অন্যতম এটি। এদের ডানা মেলে ধরলে ১৬০ সেমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সারা গায়ে ছিটে ছিটে দাগ দেখা যায়।

email:rajarouthbhbl@gmail.com • M. 9474417178